যখন আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানকে আপন দরবার থেকে তাড়িয়ে দিলেন তখন শয়তান অবকাশ প্রার্থনা করল। আল্লাহ্ তাকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দিলেন। শয়তান বললঃ তোমার ইজ্জতের কসম; যে পর্যন্ত মানুষের দেহে প্রাণ থাকবে, আমি তার অন্তর থেকে বের হব না। এরশাদ হলঃ আমিও আমার ইজ্জত ও প্রতাপের কসম খেয়ে বলছি, যে পর্যন্ত মানুষের মধ্যে প্রাণ থাকবে সেই পর্যন্ত তাদের তওবা প্রত্যাখ্যান করব না।

মাওলানা আশেক এলাহী বুলন্দ শহরী মোহাজেরে মাদানী

ফাজায়েলে তওবা
ও
গোনাহের তালিকা

মূলঃ হযরত মওলানা আশেক এলাহী বুলন্দ শহরী
মোহাজেরে মাদানী

অনুবাদঃ মোহাম্মদ খালেদ

মোহাম্মদী লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা

অনুবাদকের নিবেদন

কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات .

অর্থঃ আর তিনি এমন যে, স্বীয় বান্দাগণের তওবা কবুল করিয়া থাকেন এবং তিনি গোনাহসমূহ ক্ষমা করিয়া দেন।

হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

لو عملتم الخطايا حتى تبلغ السماء ثم ندمتم لتاب الله عليكم ।

অর্থঃ যদি তোমরা আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত গোনাহ্ কর, উহার পর অনুতপ্ত হও, তবে অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদের তওবা কবুল করিবেন।

বর্ণিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, বান্দা যখন অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন আল্লাহ্ পাক তাহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেন। বস্তুতঃ মানুষ মাত্রই অপরাধী, পাপ–পূণ্যের সংমিশ্রণেই মানুষ। মানুষ শুধু নেক আমল করিবে অথবা গোনাহের সমুদ্রে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিবে– ইহা সঙ্গত নহে। শুধু নেক আমল ও কল্যাণকর্মে আত্মনিবেদিত হওয়া ফেরেস্তার বৈশিষ্ট্য। আর শুধু গোনাহ্–খাতা ও অকল্যাণে নিমজ্জিত থাকা শয়তানের স্বভাব। পক্ষান্তরে অনাচার ও পাপকর্মে জড়াইয়া পড়ার পর পুনরায় তওবা করিয়া সুপথে ফিরিয়া আসা– ইহা আদম সন্তানের ধর্ম। যেই ব্যক্তি কল্যাণের পথে ফিরিয়া আসিয়া যাবতীয় অকল্যাণের ক্ষতিপূরণ করিয়া লয় সে–ই প্রকৃত মানুষ। এই ক্ষেত্রে বান্দার প্রতি আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করিয়া কালামে পাক ঘোষণা করিয়াছেঃ তিনি স্বীয় বান্দাগণের তওবা কবুল করেন এবং গোনাহ্ ক্ষমা করিয়া দেন। আর এই তওবার সুযোগ গ্রহণের প্রতি উৎসাহিত করিয়া হাদীসে পাকে ঘোষণা করা হইয়াছেঃ যদি তোমরা আকাশ পর্যন্ত গোনাহ্ কর, উহার পর অনুতপ্ত হও, তবে অবশ্যই আল্লাহ্ পাক তোমাদের তওবা কবুল করিবেন।

মানুষের দ্বারা পাপ হওয়া স্বাভাবিক। গোনাহের পর যদি খালেছ নিয়তে তওবা করা হয় তবে সে এমন হইয়া যায় যেন সে কখনো পাপই করে নাই। আর গোনাহের পর তওবা না করিয়া কবরে গেলে কঠিন আজাব ভোগ করিতে হইবে। বলাবাহুল্য দোযখের আগুন সহ্য করার তুলনায় দুনিয়াতে অনুতাপের

অনলে দগ্ধ হওয়া মানুষের পক্ষে অনেক সহজ। সুতরাং শয়তানের ধোকায় পড়িয়া গোনাহ্ করার পর মানুষের করণীয় হইল, দ্রুত তওবার দারস্থ হওয়া। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তওবার মত এহেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাধারণ মুসলমানদের ধারণা একেবারেই সীমিত। অবশ্য এই বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের মত প্রামাণ্য গ্রন্থের অভাব সমস্যার অন্যতম কারণ বলিয়া বিবেচিত। আমাদের জানামতে বাংলা ভাষায় এই যাবৎ তওবার উপর পৃথক কোন গ্রন্থ রচিত হয় নাই। এই গ্রন্থটি পাক-ভারত উপমহাদেশের বরেণ্য ব্যক্তিত্ব ভারতের হযরত মওলানা আশেক এলাহী সাহেব কর্তৃক উর্দু ভাষায় রচিত "ফাজায়েলে তওবা ও এস্তেগফার" এবং "গোনাহ্‌ঁকী ফিহ্‌রিস্ত" গ্রন্থদ্বয়ের সরল বঙ্গানুবাদ। ইহাতে তিনি তওবার গুরুত্ব, আবশ্যকতা, তওবার হাকীকত, ফজিলত, তওবার শর্ত, সময়কাল, তওবার পদ্ধতি, কালামে পাকে তওবার নির্দেশ এবং সেই সঙ্গে তওবা সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়াদি অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

অত্রগ্রন্থের উল্লেখযোগ্য সৌন্দর্য হইল, উপস্থাপিত বিষয়সমূহ কোরআন-হাদীসের উদ্ধৃতিসহ উল্লেখ করা হইয়াছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূল কিতাবের উপস্থাপনা অক্ষুণ্ন রাখিয়া অনুবাদের নিজস্ব ধারা অনুসরণ করা হইয়াছে।

বিশিষ্ট লেখক বন্ধুবর মওলানা যুবায়ের সাহেব পাণ্ডুলিপিটি আগাগোড়া একবার দেখিয়া দিয়া বেশ কিছু খুঁত দূর করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ্ পাক তাঁহাকে উহার উত্তম বিনিময় দান করুন। আমার বিদ্যার স্বল্পতা ও অযোগ্যতার কারণে কিছু ভুল-ভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক। এই বিষয়ে সুধী জনের এছলাহী পরামর্শ পাইলে তাহা সাদরে গ্রহণ করা হইবে। আল্লাহ্ পাক আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে নাজাতের উছিলা করিয়া দিন। আমীন।

বিনীত-

মোহাম্মদ খালেদ
কুমিল্লা পাড়া, আশ্রাফাবাদ,
কামরাঙ্গীর চর, ঢাকা,

১৬ই জানুয়ারী ১৯৯৩ ইং

বিষয় **সূচীপত্র** পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে তওবা কবুল ও মাগফেরাতের ওয়াদা ১৫
তওবা ও এস্তেগফারের হুকুম ২২
তওবা ও নেক আমলকারীগণ কামিয়াব হইবেন ২৩
আত্মশুদ্ধি তওবার শর্ত ২৩
আলমে বরজখের দৃশ্য প্রকাশ পাইবার পর তওবা কবুল হয় না ২৮
তওবা ও এস্তেগফার দ্বারা পার্থিব উপকার ৩১
আলোচিত আয়াত সমূহের সার সংক্ষেপ ৩৪

দ্বিতীয় অধ্যায় ৩৫

তওবার গুরুত্ব, ফজিলত এবং আল্লাহ্র দিকে রুজু হওয়া ৩৭
পশ্চিম দিক হইতে সূর্য উদয় হইবার পূর্ব পর্যন্ত তওবার দরজা খোলা থাকিবে ৪০
গোনাহের পরিমাণ যত বেশীই হউক তওবা করিলে ক্ষমা করা হইবে ৪১
আল্লাহ্র ক্ষমাগুণ ৪৪
তওবাকারী নিষ্পাপ হইয়া যায় ৪৫
মোমেনের দ্বারা গোনাহ্ হওয়া অসম্ভব নহে, তবে সে সঙ্গে সঙ্গেই তওবা করিয়া নেয় ৪৬
গোপন পাপের তওবা গোপনে এবং প্রকাশ্য পাপের তওবা প্রকাশ্যে করিতে হইবে ৪৮
নেক আমলই বদ আমলের কাফ্ফারা ৫০
গোনাহের কারণে মনে ভীতি সৃষ্টি হওয়া চাই ৫২
পাপের অনুশোচনায় মুক্তি ৫৪
গোনাহ স্বীকার করাই তওবার সূচনা ৫৮
ছোট ছোট গোনাহ্ হইতে বাচিয়া থাকার তাকীদ ৬০
কোন মুসলমান সম্পর্কে মাগফেরাত না হওয়ার মন্তব্য করা ৬৫
গোনাহ্ প্রকাশ করাও গোনাহ্ ৬৯
তাহাজ্জুদের সময় তওবা করা ৭০
তওবার হাকীকত এবং উহার তরীকা ৭৩
হক্কুল্লাহ্ ও হক্কুল এবাদ আদায় করা ৭৮
আল্লাহ্র হক আদায়ের বিবরণ ৭৮
কাজা নামাজ ৭৯
যাকাত আদায় ৮১

বিষয়	পৃষ্ঠা
কাজা রোজা	৮১
হজ্ব আদায় করা	৮২
বান্দার হক আদায়ের বিবরণ	৮৩
মালের হক	৮৩
মান–সম্ভ্রমের হক	৮৪
একটি প্রশ্নের জবাব	৮৬
হকুকুল এবাদ সংক্রান্ত জরুরী জ্ঞাতব্য	৮৯
একটি ভুল ধারণার অবসান	৯৮
মুরীদের কর্তব্য	১০১
তৃতীয় অধ্যায়	১০৩
পূর্বকথা	১০৫
এস্তেগফার করা	১০৫
আমলনামায় এস্তেগফার	১০৬
আমলনামার শুরু ও শেষ এস্তেগফার	১০৭
এস্তেগফারের সুফল	১০৮
আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করিতে থাকিব	১০৯
আত্মশুদ্ধির জন্য এস্তেগফার	১১০
আমলের পরিশুদ্ধির জন্য এস্তেগফার	১১৩
অজুর পরে এস্তেগফার করা	১১৭
এস্তেঞ্জার পরে এস্তেগফার	১১৮
সকল মজলিসে এস্তেগফার করা	১১৯
মজলিসের আলোচনার কাফ্‌ফারার জন্য এস্তেগফার	১২০
যাহার গীবত করা হইয়াছে তাহার জন্য এস্তেগফার করা	১২১
মৃত মাতা–পিতার জন্য এস্তেগফার করা	১২৫
মৃত মুসলমানের জন্য এস্তেগফার করা	১২৬
মৃত মুসলমানের মাগফেরাত কামনা করার ফজিলত	১২৭
এস্তেগফার আজাবকে বাধা দেয়	১২৮
সকল বালা–মুসীবত হইতে মুক্তির জন্য এস্তেগফার করা	১৩০
চতুর্থ অধ্যায়	১৩২
কালামে পাকে তওবা ও এস্তেগফারের দোয়াসমূহ	১৩৩
হাদীস শরীফে তওবা ও এস্তেগফারের দোয়া	১৩৮
পরিশিষ্ট	১৪৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
গোনাহের তালিকা	১৫১
সাতটি মারাত্মক গোনাহ	১৫৬
মোনাফেকের চারিটি স্বভাব	১৫৭
নামাজে অবহেলা করা	১৫৮
স্বেচ্ছায় নামাজ ত্যাগ করা ও মদ পান করা	১৫৯
মোনাফেকের নামাজ	১৫৯
নামাজে চুরি	১৬০
জামাত তরক করা	১৬০
জুমুআর নামাজ তরক করা	১৬১
লোক দেখানো এবাদত	১৬২
গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে এবাদত	১৬৪
দুনিয়ার উদ্দেশ্যে আমল করা	১৬৫
প্রসিদ্ধি লাভের জন্য আমল করা	১৬৫
যাকাত আদায় না করা	১৬৭
হজ্ব আদায় না করা	১৬৮
রমজানের রোজা ত্যাগ করা	১৬৮
কোরআন শরীফ পড়িয়া ভুলিয়া যাওয়া	১৬৯
বেদ্‌আত জারী করা	১৭০
দুনিয়ার জন্য এলেম হাসিল করা	১৭১
এলেম গোপন করা	১৭১
যাহা হাদীস নহে উহাকে হাদীস হিসাবে বর্ণনা করা	১৭২
আল্লাহ্‌ওয়ালাদের সঙ্গে দুশমনী করা	১৭২
হারাম মাল খাওয়া	১৭৩
উপার্জিত হারাম সম্পদ রাখিয়া যাওয়া	১৭৩
সুদ খাওয়া	১৭৪
সুদের হিসাব লেখা এবং উহার সাক্ষী হওয়া	১৭৪
জমি দখল করা	১৭৫
বিনা দাওয়াতে আহার করা	১৭৬
মদ, মুরদার, শুকর ও মূর্তি বিক্রয় করা	১৭৭
মাপে কম দেওয়া	১৭৮
ঘুষ দেওয়া ও গ্রহণ করা	১৭৮
ট্যাক্স উশুল করা	১৭৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
মিথ্যা শপথ করিয়া কাহারো হক নষ্ট করা	১৭৯
অন্যায়ভাবে কাহারো সম্পদ দাবী করা	১৮০
মজুদদারী	১৮০
মিথ্যা শপথ ও মিথ্যা সাক্ষ্য	১৮১
আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কাহারো নামে কসম খাওয়া	১৮২
গোনাহের কাজে নজর মানা	১৮২
আত্মহত্যা করা	১৮৩
কোন মুসলমানকে হত্যা করা	
খেয়ানত করা	১৮৫
ওয়াদা খেলাফী করা	১৮৬
প্রতারণা করা	১৮৬
প্রজাদের অধিকার খর্ব করা	১৮৭
ন্যায়পরায়ন শাসক ও জালেম শাসক	১৮৭
বিচারে জুলুম করা	১৮৮
ক্ষমতাসীনদের অত্যাচারে সাহায্য করা	১৮৮
জুলুম ও কৃপণতা	১৮৯
বান্দার হক নষ্ট করা	১৯০
ঋণী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করা	১৯২
মানুষের দোষ অন্বেষণ ও খারাপ ধারণা পোষণ	১৯৪
সম্পর্কচ্ছেদ	১৯৪
হিংসা করা	১৯৬
কোন মুসলমানের অনিষ্ট করা বা প্রতারণা করা	১৯৭
মানহানি করা	১৯৭
অপবাদ দেওয়া	১৯৮
জুয়া খেলা ও খোঁটা দেওয়া	১৯৮
প্রসঙ্গঃ মদ	১৯৯
দশ ব্যক্তি উপর রাসূলে পাকের (সাঃ) অভিশাপ	১৯৯
মাদক দ্রব্য হারাম	
মাদক সেবনের শাস্তি	২০০
বাজনাবাজানো	২০১
ঢোলবাজানো	২০২
দাইয়ুস হওয়া	২০৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
কাহাকেও কাফের বলা	২০৩
গালি দেওয়া	২০৪
মিথ্যা বলা	২০৪
চোগলখোরী	২০৪
দুমুখো স্বভাব	২০৫
বিদ্রূপ করা	২০৫
অভিশাপ দেওয়া	২০৬
মন্দভাবে কাহারো বিবরণ প্রদান করা	২০৬
মাতা–পিতাকে কষ্ট দেওয়া	২০৭
আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা	২০৮
প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া	২০৮
গণক ও জ্যোতিষের শরণাপন্ন হওয়া	২০৯
মিথ্যা শপথ করিয়া মাল বিক্রয় করা	২০৯
ত্রুটি গোপন করিয়া বিক্রয় করা	২১০
গায়রুল্লাহর নামে জবাই করা এবং জমির সীমানা চুরি করা	২১০
স্ত্রীকে স্বামীর বিরুদ্ধে বীতশ্রদ্ধ করা	২১২
বংশ পরিবর্তন করা	২১২
অহংকারের পরিণতি	২১৩
ব্যভিচার	২১৪
ব্যভিচার ও সুদের পরিণতি	২১৪
বৃদ্ধ বয়সে ব্যভিচার করা	২১৫
বিকৃত যৌন সঙ্গম ও সমমৈথুন	২১৬
খুশবু লাগাইয়া পুরুষদের সামনে যাওয়া ব্যভিচার	২১৮
কু–দৃষ্টি	২১৯
বিজাতীয় অনুকরণ	২২০
গোঁফ বড় করা	২২০
কৃত্রিম চুল ব্যবহার এবং শরীর খোদাই করিয়া উল্কি অঙ্কন করা	২২১
নারী ও পুরুষ পরস্পরের পোশাক পরিবর্তন করা	২২৩
সুনাম অর্জনের উদ্দেশ্যে পোশাক পরিধান করা	২২৩
মানুষকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে অলঙ্কার পরা	২২৩
উলঙ্গ নারী	২২৪
পায়ের গোড়ালীর নীচে কাপড় পরা	২২৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
পুরুষদের স্বর্ণ ব্যবহার করা	২২৫
ঘরে কুকুর ও ছবি রাখা	২২৬
ছবি তৈরী করা	২২৬
জ্যোতিষ বা গণকের নিকট গমন করা	২২৭
সম্পর্ক ছিন্ন করা	২২৮
জোরপূর্বক ইমামতী করা	২৩০
মাতম করা	১৩১
স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা না করা	২৩৩
স্বামীর অবাধ্যতা	২৩৪
বেপর্দা হওয়া	২৩৪
শশুর বাড়ীর আত্মীয়দের সঙ্গে বেপর্দার পরিণতি	২৩৫
গায়রে মাহ্‌রামের সঙ্গে অবস্থান করা	২৩৬
কাহারো ছতর দেখা বা নিজের ছতর দেখানো	২৩৬
আহারের যোগান না দেওয়া	২৩৬
প্রস্রাব হইতে সতর্ক না হওয়া	২৩৭
সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ তরক করা	২৩৭
হযরত ছাহাবায়ে কেরামকে মন্দ বলা	২৩৯
অবৈধ অসিয়ত করা	২৩৯
শেষনিবেদন	২৪১
পরিশিষ্ট	২৪৪
তওবা সংক্রান্ত কতিপয় ঘটনা	২৪৪
এক মদ্যপের তওবা	২৪৫
এক মূর্তি পূজকের ঘটনা	২৪৭
দুনিয়া আল্লাহ্‌র অলীদের সেবা করে	২৪৯
এক বাদশাহ্ ও বাদী	২৫০
দুই বাদশা'র ঘটনা	২৫২
কুকুরের সেবা করিয়া মুক্তিলাভ	২৫৪
এক বিলাসী সরদারের তওবা	২৫৫
রোগীর সেবায় এক বুজুর্গ	২৫৮
হযরত মালেক বিন দিনারের তওবা	২৬০
একটি অলৌকিক ঘটনা	২৬৩
পঙ্কিল জীবন হইতে তওবা করার কয়েকটি ঘটনা	২৬৫
তওবার আগে ও পরে	২৭১

প্রথম অধ্যায়

পবিত্র কোরআনে যেই সকল আয়াতে তওবা ও এস্তেগফারের হুকুম করা হইয়াছে এবং সেই সকল আয়াতে (শর্ত অনুযায়ী তওবা করিলে) উহা কবুল হওয়ার ওয়াদা করা হইয়াছে এই অধ্যায়ে সেইসকল আয়াত সমূহ তরজমা সহ উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই সঙ্গে তওবার আনুসঙ্গিক আয়োজন এবং উহার উপকারিতা এবং ফায়দার বিবরণও দেওয়া হইয়াছে।

আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে তওবা কবুল ও মাগফেরাতের ওয়াদা

আয়াত—১

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّاٰتِ وَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ـ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ يَزِيْدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ط وَالْكٰفِرُوْنَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ

অর্থঃ আর তিনি এমন যে, স্বীয় বান্দাগণের তওবা কবুল করিয়া থাকেন এবং তিনি গোনাহ্সমূহ ক্ষমা করিয়া দেন, আর তোমরা যাহা কিছু কর, তিনি তাহা অবগত আছেন। আর তিনি সেই সমস্ত লোকের ইবাদত কবুল করিয়া থাকেন যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তাহারা নেক কাজ করিয়াছে এবং তাহাদিগকে নিজের অনুগ্রহে আরো অধিক প্রদান করিয়া থাকেন; আর যাহারা কুফর করিতেছে তাহাদের জন্য কঠিন আজাব রহিয়াছে।

—ছুরা শূরা, রুকু—৩

আয়াত—২

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ج اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ وَاَنِيْبُوْا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ـ

অর্থঃ আপনি বলিয়া দিন, (আল্লাহ্ বলেন,) হে আমার বন্দাগণ! যাহারা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করিয়াছ, তোমরা আল্লাহ্ তা'য়ালার রহমত হইতে নিরাশ হইও না; নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ (অতীতের) সমস্ত গোনাহ্ ক্ষমা করিবেন; নিশ্চয় তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, দয়ালু। আর তোমরা স্বীয় রবের দিকে ফিরিয়া আস এবং তাহার আদেশ পালন কর ইহার পূর্বে যে, তোমাদের উপর আজাব আসিয়া পড়ে, অতঃপর (তোমরা কাহারো নিকট হইতে) কোন সাহায্য না পাও। —ছুরা যুমার, রুকুঃ ৬

উপরে বর্ণিত আয়াতটি মোমেনদের জন্য বড়ই উৎসাহের বিষয়। ইহাতে ঈমানদার বান্দাগণকে হুকুম করা হইয়াছে যে, তোমরা আল্লাহ্ পাকের রহমত ও অনুগ্রহ হইতে নিরাশ হইও না। আল্লাহ্ পাকের অফুরন্ত রহমতের সামনে বান্দার লক্ষ কোটি গোনাহ্ও কিছুই নহে।

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে–

وَلَا تَايْـَٔسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يَايْـَٔسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ۝

অর্থঃ আর আল্লাহ্ তা'য়ালার রহমত হইতে নিরাশ হইও না; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'য়ালার রহমত হইতে কেবল সেই সকল লোকেরাই নিরাশ হয় যাহারা কাফের। –ছুরা ইউসুফ, রুকুঃ ১০

আরো এরশাদ হইয়াছে–

قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖٓ اِلَّا الضَّآلُّوْنَ ۝

অর্থঃ ইব্রাহীম বলিলেন, নিজ পরওয়ারদিগারের রহমত হইতে কে নিরাশ হয় পথভ্রষ্ট লোকেরা ব্যতীত?

আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু। তিনি আরহামুর রাহিমীন। কাফের ও মোশরেক ব্যতীত সকলকেই তিনি ক্ষমা করিয়া দিবেন। আমাদের দ্বারা যত বড় গোনাহ্ই হউক না কেন তাঁহার রহমত হইতে কখনো নিরাশ না হইয়া বরাবর তওবা করিতে হইবে। বার বার তওবা ভঙ্গ-হইবার পরও নিয়মিত তওবা করিতে থাকিলে ইনশাআল্লাহ্ একদিন নিশ্চয়ই খাঁটি তওবা নসীব হইবে।

ছগীরা গোনাহ্ সমূহের মাগফেরাত ও কাফ্ফারা নেক আমল দ্বারাও হইতে থাকে। কিন্তু কবীরা গোনাহ্ হইতে ক্ষমা পাইতে হইলে অবশ্যই তওবা করিতে হইবে। যদি তওবা করা না হয়, তবে ঈমানের সাথে মৃত্যু হইলেও কোন প্রকার আজাব ও শাস্তি ছাড়াই তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে এমন বলা যাইবে না। আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করিলে ক্ষমা করিতে পারেন, অথবা দোজখে নিক্ষেপ করিয়া শাস্তি দানের পর পাক–ছাফ করিয়াও বেহেস্ত দান করিতে

পারেন। সুতরাং পরকালের কঠিন আজাবের আশঙ্কা ও সম্ভাবনা যখন আছে, সেহেতু আল্লাহ্ পাকের রহমত হইতে নিরাশ না হইয়া তাঁহার নিকট মাগফেরাতের আশায় হামেশা খাঁটি তওবা ও এস্তেগফার করিতে হইবে। যেন পাক–ছাফ অবস্থায় মৃত্যু নসীব হয়।

অনেককেই অজ্ঞতা বশতঃ বলিতে শোনা যায় যে, "আমরা দোজখের আজাব ভোগ করিয়া লইব।" –এই মন্তব্য যাহারা করে, দোজখের আজাব সম্পর্কে তাহাদের কোন ধারণা নাই। দুনিয়ার আগুনকে আমরা এক মিনিটও হাতে রাখিতে পারি না; হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী দোজখের আগুন দুনিয়ার আগুন হইতে সত্তর গুণ বেশী গরম হইবে। এখন ভাবিয়া দেখুন; দোজখের সেই কঠিন আগুনকে আমরা কিভাবে সহ্য করিব? কোন্ বিবেচনায় আমরা দোজখের সেই ভয়াবহ আজাবকে সহ্য করিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি?

পাপের বিনিময়ে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াতে যেই সামান্য শান্তি পাওয়া যায় উহার মোকাবেলায় পরকালের ভয়াবহ আজাবের কথা স্মরণ করিয়া মনকে পাপ হইতে কি ফিরাইয়া রাখা যায় না? পরকালের কঠিন আজাব হইতে নাজাত পাইতে হইলে সর্বদা তওবা ও এস্তেগফারের দিকে মনোযোগী হইতে হইবে।

আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে ক্ষমা ও মাগফেরাতের সুসংবাদ পাইয়া মনে মনে যেন আবার এইরূপ ধারণা সৃষ্টি না হয় যে, মৃত্যুর পূর্বে তওবা করিয়া লইলে সকল ঝামেলা চুকিয়া যাইবে। এইরূপ ধারণা করা বড়ই বোকামি। ভবিষ্যতের কথা কেহই বলিতে পারে না, কখন কি অবস্থায় মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইবে এই বিষয়ে কাহারো কোন ধারণা নাই। তওবার পূর্বেও মৃত্যু আসিয়া হাজির হইতে পারে। আর অভিজ্ঞতা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, যাহারা সকল সময় অন্যায়–অপরাধ ও গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে যত্নবান হইয়াছে এবং যখনই কোন গোনাহ্–খাতা হইয়াছে সঙ্গে সঙ্গে উহার জন্য তওবা করিয়া লইয়াছে, তাহাদের জীবনেই ছহী তওবার সৌভাগ্য হইয়াছে।

পক্ষান্তরে যাহারা আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে ক্ষমা ও মাগফেরাতের সুসংবাদকে সামনে রাখিয়া মনে করিয়াছে; আল্লাহ্ পাক গাফুরুররাহীম, তিনি বান্দার সকল গোনাহ্ খাতা ক্ষমা করিয়া দিবেন। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া দিনের পর দিন নিজেকে গোনাহ্ ও পাপের কাজে নিয়োজিত রাখিয়াছে

তাহাদের ভাগ্যে কখনো তওবার সুযোগ হয় নাই।

আল্লাহ্ পাকের ফরমাবরদার ও নেক বান্দাদের পক্ষে ইহা কখনো শোভা পায় না যে, মাগফেরাতের সুসংবাদ শুনিবার পর নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিবে। বরং আল্লাহ্ পাক যে ক্ষমা করিয়া দিবেন এই সুসংবাদ শুনিবার পর গোনাহ্ খাতার ব্যাপারে আরো বেশী সর্তক হইয়া নেক কাজে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা বড় সুসংবাদ আর কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনেই তাহার সকল কিছু (ছোট খাট ত্রুটি) ক্ষমার ঘোষণা দিয়াছেন। তথাপি রাতের দীর্ঘ সময় নামাজে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহার কদম মোবারক ফুলিয়া যাইত। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এবাদতের মধ্যে এত পরিশ্রম করেন, অথচ আল্লাহ্ পাক আপনার আগে-পরের সকল ত্রুটি ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। উত্তরে তিন এরশাদ করিলেন-

أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا

আমি কি আল্লাহ্ পাকের কৃতজ্ঞ বান্দা হইব না? -বোখারী, মুসলিম

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক আমার উপর এত অনুগ্রহ করিয়াছেন যে, আমার সকল কিছু ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং উহার কৃতজ্ঞতার দাবী হইল, আমি যেন আরো বেশী ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভে অগ্রসর হইতে থাকি।

ছাহাবায়ে কেরাম রাজিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইনদের অনেকের ব্যাপারেই পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতেই বেহেস্তী হওয়ার সুসংবাদ দান করিয়াছিলেন। আশারায়ে মোবাশ্শারা বা দশজন ছাহাবী জান্নাতী হওয়ার বিষয়টি প্রায় সকলেরই জানা আছে। তা ছাড়া বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ছাহবাগণকে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে এই সুসংবাদ শুনাইলেন যে-

اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ

-তোমরা যাহা ইচ্ছা তাহাই কর; আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছি।
-মেশকাত, পৃঃ ৫৭৭

উল্লেখিত ছাহাবাগণ ব্যতীত আরো কতক ছাহাবার ব্যাপারে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের সুসংবাদ দান করিয়াছিলেন। কিন্তু ছাহাবাগণ এই ঘোষণা পাইয়া শরীয়তের হুকুম-আহ্কাম ত্যাগ করিয়া গোনাহ্-খাতায় লিপ্ত হইয়া যান নাই। বরং এই ঘোষণা পাইবার পরও বরাবর তাহারা যাবতীয় অন্যায়-অপরাধ হইতে পরহেজ করিয়া নেক আমলে নিমগ্ন ছিলেন। আর কখনো কোন মামুলী ধরনের গোনাহ্ হইয়া গেলে আল্লাহ্ পাকের ভয়ে পেরেশান হইয়া যাইতেন। ছাহাবায়ে কেরামগণের এই আদর্শ অনুসরণ করা আমাদের সকলের কর্তব্য।

মোট কথা, আশা এবং ভয়ের মধ্যেই ঈমান নিহিত। অন্তরে আল্লাহ্ পাকের রহমতের প্রবল আশা পোষণ করিবে এবং তাহার কঠিন আজাবকেও ভয় করিবে। আল্লাহ্ পাক হযরত আম্বিয়া আলাইহিমুস্সালামগণের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন-

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

অর্থঃ ইহারা সকলে ধাবমান থাকিতেন নেক কাজের প্রতি এবং আশা ও ভয় সহকারে আমার এবাদত করিতেন। -ছুরা আম্বিয়া, রুকুঃ ৬

অন্যত্র মোমেনদের ছিফাত বর্ণনা করিয়া বলা হইয়াছে-

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

অর্থঃ তাহাদের পাঁজরসমূহ শয্যা হইতে পৃথক থাকে, এই প্রকারে (পৃথক থাকে) যে, তাহারা আশায় এবং ভয়ে স্বীয় রবকে ডাকিতে থাকে, আর আমার প্রদত্ত বস্তুসমূহ হইতে ব্যয় করে। -ছুরা সেজদা, রুকুঃ ২

ওলামায়ে কেরামগণ বলিয়াছেন, মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়া অন্তরে সকল সময় ভয় রাখা উচিৎ।

আয়াত—৩

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

অর্থঃ অতঃপরও কি তাহারা আল্লাহ্ তা'য়ালার সমীপে তওবা করে না এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে না? অথচ আল্লাহ্ তা'য়ালা অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। —ছুরা মায়েদা, রুকূঃ ১০

আয়াত—৪

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

অর্থঃ তাহারা কি ইহা অবগত নহে যে, আল্লাহ্ই নিজ বান্দাদের তওবা কবুল করেন, আর তিনিই ছদকা-খয়রাত কবুল করেন, আর ইহাও যে, আল্লাহ্ তা'য়ালাই হইতেছেন তওবা কবুল করিতে এবং অনুগ্রহ করিতে পূর্ণ সমর্থবান। —ছুরা তওবা, রুকূঃ ১৩

আয়াত—৫

وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا

অর্থঃ আর যে ব্যক্তি কোন দুষ্কর্ম করে, অথবা নিজ আত্মার ক্ষতিসাধন করে, অতঃপর আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে, সে আল্লাহ্কে অতীব ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময় পাইবে। —ছুরা নেছা, রুকূঃ ১৬

আয়াত—৬

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ

অর্থঃ আর আমি তাহাদের জন্য পরম ক্ষমাশীল— যাহারা তওবা করে ও ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, তৎপর সুপথে স্থায়ী থাকে।।

—ছুরা তাহা, রুকূঃ ৪

আয়াত—৭

إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا

অর্থঃ যে সমস্ত কাজ হইতে তোমাদিগকে নিষেধ করা হইয়া থাকে তন্মধ্যে যেইগুলি বড় বড় কাজ (গোনাহ), যদি তোমরা সেইগুলি হইতে পরহেজ কর, তবে আমি তোমাদের ছোট ছোট গোনাহগুলি তোমাদিগ হইতে মোচন করিয়া দিব এবং তোমাদিগকে একটি সম্মানিত স্থানে দাখিল করিব।

—ছুরা নেছা, রুকূঃ ৫

তাফ্সীরে বয়ানুল কোরআনে কবীরা গোনাহের বিভিন্ন সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। তবে এই ব্যাপারে তাফ্সীরে রূহুল মা'আনীতে বর্ণিত অভিমতকেই অধিক নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে করা হয়। ঐ বর্ণনায় বলা হইয়াছে, ঐ সকল অপরাধকেই কবীরা গোনাহ্ বলা হয় যেই সকল অপরাধের উপর শরীয়তের শাস্তি, শাস্তির ভয় অথবা অভিশাপ করা হইয়াছে। দ্বীনের প্রতি অবহেলা ও অবজ্ঞা প্রদর্শনকেও কবীরা গোনাহ্ হিসাবে গণ্য করা হয়। এখানে স্মরণ রাখিবার বিষয় হইল, হাদীসে পাকে কবীরা গোনাহের যেই বিবরণ উল্লেখ করা হইয়াছে উহাই চূড়ান্ত নহে।

ছগীরা গোনাহ্ বা ছোট ছোট গোনাহের ক্ষেত্রে মোটামুটি তিনটি অবস্থা সৃষ্টি হয়—

একঃ ছগীরা গোনাহ্ করিবার পর যদি কবীরা গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকে এবং শরীয়তের জরুরী হুকুম-আহ্কামের পাবন্দী করে তবে সেই ক্ষেত্রে ছগীরা গোনাহ্সমূহ ক্ষমা করিয়া দেওয়ার ওয়াদা করা হইয়াছে। সাত নং আয়াতে এই বিষয়ের কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে।

দুইঃ ছগীরা গোনাহ্ করিবার পর, শরীয়তের জরুরী আহ্কাম মানিয়া চলে বটে কিন্তু কবীরা গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকে না।

তিনঃ তৃতীয় অবস্থা হইল, শরীয়তের জরুরী আহ্কাম মানিয়া চলে না তবে কবীরা গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকে। শেষ দুইটি অবস্থায় ছগীরা গোনাহ্সমূহ ক্ষমা করার ওয়াদা করা হয় নাই। তবে ইহা ভিন্ন কথা যে, আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা

করিলে কবীরা গোনাহ্ও ক্ষমা করিয়া দিতে পারেন। আর শেষ দুইটি অবস্থার সহিত যেহেতু কবীরা গোনাহ্সমূহ ক্ষমা করিয়া দেওয়ার ওয়াদা করা হয় নাই, সেহেতু ঐ ক্ষেত্রে ছগীরা গোনাহেরও শাস্তি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইহাই আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত। অর্থাৎ ছগীরা গোনাহের উপরও শাস্তি হইতে পারে এবং আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করিলে কবীরা গোনাহের উপরও রহম করিতে পারেন।

তওবা ও এস্তেগফারের হুকুম

আয়াত—৮

وَمَا تُقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অর্থঃ আর যে নেক আমল তোমরা নিজেদের জন্য (আখেরাতের পুঁজি স্বরূপ) পূর্বে প্রেরণ করিবে, আল্লাহর্ সমীপে পৌঁছিয়া তোমরা উহার প্রতিফল তদপেক্ষা উত্তম এবং প্রতিদান হিসাবে শ্রেষ্ঠতম প্রাপ্ত হইবে; আর আল্লাহ্র নিকট গোনাহ্ মোচনের প্রার্থনা করুন; নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'য়ালা বড় ক্ষমাশীল,পরম দয়ালু। – ছুরা মোজ্জাম্মেল, রুকূঃ ২

আয়াত—৯

وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ ۚ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ ۵

অর্থঃ আর তোমরা নিজেদের রবের নিকট নিজেদের গোনাহ্ মাফ্ করাইয়া লও, অতঃপর তাঁহার দিকে মনোনিবেশ কর; নিশ্চয়ই আমার রব পরম দয়ালু, অতি প্রেমময়। –ছুরা হূদ, রুকূঃ ৮

আয়াত—১০

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ؕ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ তা'য়ালার সমীপে খাঁটি তওবা কর; আশা রহিয়াছে যে, তোমাদের রব (তওবার ফলে) তোমাদের গোনাহ্সমূহ মাফ্ করিয়া দিবেন, আর তোমাদিগকে (বেহেস্তের) এমন উদ্যান সমূহে দাখিল করিবেন, যাহার নিম্নদেশ দিয়া নহরসমূহ বহিতে থাকিবে, (ইহা সেই দিন হইবে) যেই দিন আল্লাহ্ নবীকে এবং ঐ সমস্ত মুসলমানকে যাহারা তাহার সহিত রহিয়াছে– অপমানিত করিবেন না। –ছুরা তাহরীম, রুকূঃ ২

তওবা ও নেক আমলকারীগণ কামিয়াব হইবেন

আয়াত—১১

فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ

অর্থঃ অবশ্য যেই ব্যক্তি তওবা করে এবং ঈমান আনে ও নেক কাজ করিতে থাকে, আশা করা যায় যে, এইরূপ ব্যক্তি সফলকামীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। –ছুরা কাসাস, রুকূঃ ৭

আয়াত—১২

تُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۵

অর্থঃ আর হে মুসলমানগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্র সমীপে তওবা কর, যেন তোমরা সফলতা লাভ করিতে পার। –ছুরা নূর, রুকূঃ ৪

আত্মশুদ্ধি তওবার শর্ত

আয়াত—১৩

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۙ اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْٓءًا ۢ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ ۢ بَعْدِهٖ وَاَصْلَحَ فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অর্থঃ তোমাদের প্রতিপালক অনুগ্রহ করাকে নিজের জিম্মায় নির্ধারিত করিয়া লইয়াছেন, তোমাদের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি অজ্ঞতা বশতঃ কোন মন্দ কাজ করিয়া বসে অতঃপর সে উহার পর তওবা করিয়া লয় এবং নিজেদের সংশোধন করিয়া লয় তবে আল্লাহ্র শান এই যে, তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম

করুণাময়। –ছুরা আনআম, রুকুঃ ৬

আয়াত–১৪

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

অর্থঃ অনন্তর আপনার প্রতিপালক এইরূপ লোকদের জন্য, যাহারা মুর্খতা বশতঃ মন্দ কাজ করিয়া ফেলিয়াছে, আবার উহার পরে তওবা করিয়াছে, এবং নিজেদের আমল সংশোধন করিয়াছে, তবে নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক ইহার পরে অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। –ছুরা নহ্‌ল, রুকুঃ ১৫

আয়াত–১৫

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

অর্থঃ অনন্তর যে ব্যক্তি এই সীমা লংঘন (অর্থাৎ চুরি) করার পর তওবা করিয়া লয় এবং আমলকে সংশোধন করিয়া লয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'য়ালা তাহার প্রতি (অনুগ্রহের) দৃষ্টি করিবেন; নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'য়ালা পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু। –ছুরা মাইদা, রুকুঃ৬

আয়াত–১৬

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ۝ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

অর্থঃ নিশ্চয় যাহারা গোপন করে আমার অবতারিত বিষয়গুলিকে যাহা উজ্জ্বল ও সুপথ প্রদর্শনকারী, আমি ঐ গুলিকে সর্বসাধারণের জন্য কিতাবে প্রকাশ করিয়া দিবার পর; ইহাদিগকে লা'নত করেন আল্লাহ্ও, আর লা'নতকারীগণও তাহাদিগকে লা'নত করেন। কিন্তু যাহারা তওবা করে এবং

সংশোধন করিয়া নেয়, আর ব্যক্ত করিয়া দেয়, তবে ইহাদের প্রতি আমি দৃষ্টি করি। আর আমি তো তওবা কবুল করা এবং অনুগ্রহ করায় খুবই অভ্যস্ত।

–ছুরা বাকারা, রুকুঃ ১৯

১৩, ১৪, ও ১৫ নং আয়াতে তওবার সঙ্গে নফ্‌সের এছলাহ বা আত্মশুদ্ধির কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। আর ১৬ নং আয়াতে صلحوا শব্দের সঙ্গে بينوا শব্দও ব্যবহার করা হইয়াছে। অর্থাৎ তওবা কবুলের জন্য শর্ত হইল ভবিষ্যতে আর গোনাহ্ না করার দৃঢ় অঙ্গীকার করা। যখন মনে মনে দৃঢ় অঙ্গীকার করিবে তখন তওবার পর ভবিষ্যতে গোনাহ্ হইতে অবশ্যই বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে। উহার পরও যদি অপরাধ হইয়া যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে তওবা করিয়া লইবে। সেই সঙ্গে তওবার পূর্বে যেই সকল হক্কুল্লাহ ও হক্কুল এবাদ (অর্থাৎ আল্লাহর হক ও বান্দার হক) নষ্ট করা হইয়াছে, উহার মধ্যে যেইগুলির ক্ষতিপূরণ সম্ভব সেইগুলির ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে এবং ভবিষ্যতে যেন আর কাহারো হক নষ্ট না হয় এই বিষয়ে সতর্ক থাকিবে। নামাজ–রোজার কাজা আদায় করা, হজ্ব ও জাকাত ফরজ থাকিলে উহা আদায় করা এবং জুলুম, খেয়ানত, ঘুষ ও চুরির মাধ্যমে যেই সম্পদ সংগ্রহ করা হইয়াছে উহা ফেরৎ দেওয়া এবং কাহারো নামে গীবত–শেকায়েত ও মিথ্যা অপবাদ করিয়া থাকিলে তাহার নিকট হইতে ক্ষমা চাহিয়া লওয়া–ইহাই ক্ষতিপূরণ।

অনেকেই মুখে মুখে তওবা করিতে থাকেন, কিন্তু নিজের অবস্থার কোন পরিবর্তন ও সংশোধনের বিষয়ে কোন ফিকির করেন না। তওবা করিবার পরও আগের মতই পাপ কার্যে লিপ্ত থাকেন। অর্থাৎ ঐ মৌখিক তওবার কোন আছর তাহাদের আমল–আখলাকে প্রকাশ পায় না। শত–সহস্র রোজা–নামাজ কাজা করিয়া রাখিয়াছে, মোটা অংকের অর্থ আত্মসাৎ করিয়া রাখিয়াছে। গীবত, পরনিন্দা ও মিথ্যা অপবাদ মুখে লাগিয়াই আছে, অথচ তাহার মুখে তওবা! তওবা!! জপের কোন বিরাম নাই; এই ধরনের তওবা একেবারই অর্থহীন। খাঁটি তওবার দাবী হইল, নিজের স্বভাব–চরিত্রের উন্নতি করা এবং আল্লাহ্‌র হক ও বান্দার হক সমূহের তালাফী ও ক্ষতিপূরণ করা।

অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিকেও দেখা যায় যে, তাহারা পার্থিব স্বার্থে সত্যকে গোপন করিয়া থাকেন এবং অপর কেহ হক ও সত্যকে গ্রহণ করিতে চাহিলে

সেখানে নিজে বাঁধার কারণ হইয়া দাঁড়ান। অর্থাৎ নিজেও হক ও সত্যকে গ্রহণ করেন না এবং অপরকেও সত্য গ্রহণ করিতে বাঁধা প্রদান করিয়া থাকেন। উপরন্তু নিজের আয়–রোজগার বন্ধ হইয়া যাইবার আশঙ্কায় সমাজে নানা প্রকার বিভ্রান্তি ও গোমরাহী ছড়াইতে থাকেন। এই প্রকৃতির লোকদের তওবা হইল, যেই সত্যকে গোপন করা হইয়াছে উহাকে প্রকাশ করা এবং যেই সকল মানুষকে গোমরাহ্ করা হইয়াছে তাহাদিগকে এই কথা জানাইয়া দেওয়া যে, আমি নিজেও গোমরাহ্ ছিলাম এবং তোমদিগকেও গোমরাহীতে নিক্ষেপ করিয়াছি। বর্তমানে আমি গোমরাহী ত্যাগ করিয়া তওবা করতঃ হক ও সত্যকে কবুল করিয়াছি, সুতরাং তোমরাও তওবা করিয়া হক ও সত্যকে কবুল কর।

সমাজের কিছু কিছু লোককে দেখা যায়, তাহারা কোন বাতেল ও গোমরাহ ফেরকার সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের ভ্রান্ত আকীদা–বিশ্বাস ও নিয়ম–নীতির প্রচার শুরু করিয়া দেন। যাহাদের কিছুটা লেখার যোগ্যতা আছে তাহারা তো দস্তুর মত ঐ বাতেল আকায়েদের স্বপক্ষে প্রবন্ধ–রচনা লিখিয়া থাকেন। পরবর্তীতে সৌভাগ্যক্রমে যদি হেদায়েত নসীব হয়, তখন শুধু ঘরে বসিয়া বসিয়াই তওবা করিয়া লন। এই ধরনের তওবা গ্রহণযোগ্য নহে।

এই ক্ষেত্রে তাহাদের কর্তব্য হইল, প্রবন্ধ–রচনা ও বই–পুস্তক লিখিয়া যেই উপায়ে গোমরাহী ছড়ানো হইয়াছে, অনুরূপভাবে পাল্টা বই লিখিয়া এবং বিশেষতঃ যেই সকল পত্র–পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখা হইয়াছে পুনরায় ঐ সকল পত্রিকাতেই সংশোধনী মূলক প্রবন্ধ লিখিয়া সকলকে এই কথা জানাইয়া দেওয়া যে, ইতিপূর্বে আমি যাহা প্রচার করিয়াছিলাম উহা গোমরাহী ও বিভ্রান্তিকর ছিল এক্ষণে আমি নিজে ঐ সকল বিষয় হইতে তওবা করিয়া লইয়াছি। সুতরাং আমার লেখা পড়িয়া যাহারা বিভ্রান্ত হইয়াছেন তাহারাও ঐ সকল গোমরাহী ও ভ্রান্ত মতবাদ হইতে তওবা করিয়া নিন।

যাহা প্রচার করা হইয়াছিল উহার প্রতিটি বিষয়কে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করিতে হইবে। মোট কথা, যেই পরিমাণ বিভ্রান্তি ছড়ানো হইয়াছে, যথাসাধ্য পাল্টা প্রচারের মাধ্যমে উহার ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে।

রূহুল মায়ানীর গ্রন্থকার ছুরা বাক্বারার الذين تابوا وأصلحوا وبينوا আয়াতাংশের তাফ্সীরে লিখেন–

যাহা কিছু তাহারা নষ্ট করে তাহা সংশোধন করিয়া লয়। আর তাহা এইভাবে যে, আল্লাহ্র হক ও সৃষ্ট জীবের হক যথাযথভাবে আদায় করে। সেই হিসাবে তাহারা তাহাদের জাতিকে যাহাদিগকে তাহারা বিভ্রান্ত করিয়াছিল, এখন তাহাদিগকে সঠিক পথ দেখায়। বিকৃত কথামালাকে দূরে সরাইয়া দেয়, সত্য গোপন করিবার লক্ষ্যে যাহা কিছু লিখিয়াছিল সেই সকল স্থানে সঠিক ও বিশুদ্ধ কথাটি লিখে।

আল্লাহ্ পাক ছুরা মায়েদায় চুরির অপরাধে হাত কাটার হুকুম দানের পর এরশাদ করেন–

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ

উক্ত আয়াতাংশের তাফ্সীরে রূহুল মায়ানীর গ্রন্থকার লিখেন–তাহারা চুরি হইতে সংশোধনের পথ গ্রহণ করে। চুরির যাবতীয় ত্রুটি ও অন্যায় মোচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সম্ভব হইলে চুরিকৃত মাল মূল মালিকের নিকট ফিরাইয়া দেয়। অথবা মালিকের নিকট হইতে উহার বৈধতার জন্য অনুমতি লাভ করে। আর যদি মূল মালিকের সন্ধান পাওয়া সম্ভব না হয় তবে আল্লাহ্র পথে উহা ব্যয় করিয়া দেয়। আবার কেহ কেহ উহার সহিত এই কথাও বাড়াইয়াছেন– অতঃপর সে নিজ তওবার উপর বহাল থাকিয়া যাবতীয় সৎকর্ম সম্পাদন করে।

উপরে কালামে পাকের বিভিন্ন স্থানে তওবার সহিত আত্মশুদ্ধির বিষয়টির উপর আমরা যেই ব্যাখ্যা দিয়াছি, রূহুল মায়ানীর উপরোক্ত তাফ্সীর ও ব্যাখ্যার উদ্ধৃতির ফলে উহা আরো স্পষ্ট হইয়া গেল।

জনৈক প্রখ্যাত লেখক এক বুজুর্গের দরবারে আসিয়া স্বীয় নফ্সের এছ্লাহ ও আত্মশুদ্ধির ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বুজুর্গ পূর্ব হইতেই জানিতেন যে, আগন্তুক একজন মুক্তমনের লেখক এবং ইতিমধ্যেই সে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিরুদ্ধেও লেখা–লেখি করিয়াছে। সুতরাং বুজুর্গ ঐ ব্যক্তিকে এছ্লাহী সম্পর্ক স্থাপনের জন্য শর্ত আরোপ করিয়া বলিলেন, এই যাবৎ তুমি আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিরুদ্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছ, সাধারণ ঘোষণার মাধ্যমে উহা হইতে তোমার মতামত প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পক্ষে মত প্রকাশ করিয়া নিজের সকল কিতাবকে সংশোধন করিতে হইবে। লেখক সত্যিকার অর্থেই আত্ম-সংশোধনের উদ্দেশ্যে বুজুর্গের দরবারে হাজির হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি বুজুর্গের শর্ত মানিয়া লইলেন এবং প্রথমে সামগ্রিকভাবে নিজের মত পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করিলেন। পরে ক্রমে নিজের সকল বই-পুস্তক সংশোধন করিয়া লইলেন।

আসল কথা হইল, আল্লাহ্ পাক যাহাকে হেদায়েতের দৌলত নসীব করেন সে কখনো লোক-লজ্জা ও দুনিয়ার মান-সম্মানের কথা চিন্তা করে না। পরকালের কঠিন আজাব ও গজবের ভয় তাহার অন্তরকে সর্বদা আত্মশুদ্ধির দিকে উৎসাহিত করিতে থাকে। সে কেবলি ভাবিতে থাকে যে, আজ যদি আমি নফ্‌সের সংশোধন না করিয়া নিজের মনগড়া মতের উপরই অটল থাকি, তবে আখেরাতে আমার পরিণতি কি হইবে?

আলমে বরজখের দৃশ্য প্রকাশ পাইবার পর তওবা কবুল হয় না

আয়াত-১৭

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَأُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ج حَتّٰى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّيْ تُبْتُ الْاٰنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ط أُولٰٓئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا

অর্থঃ তওবা, যাহা কবুল করা আল্লাহ্‌র দায়িত্বে রহিয়াছে, উহা তো কেবল তাহাদেরই জন্য যাহারা বোকামিবশতঃ কোন পাপ করিয়া ফেলে, অতঃপর অবিলম্বে (মৃত্যু আসিবার পূর্বেই) তওবা করে সুতরাং এইরূপ লোকের তওবাই আল্লাহ্ কবুল করিয়া থাকেন; আর আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। আর এইরূপ লোকের জন্য তওবা নাই যাহারা পাপ করিতে থাকে, এ পর্যন্ত যে, যখন তাহাদের মধ্যে কাহারো সম্মুখে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়।

তখন বলে-আমি এখন তওবা করিতেছি, আর না ঐ সমস্ত লোকদের জন্য যাহারা মৃত্যুর সম্মুখীন হয় কুফরীর অবস্থায়। ইহাদের জন্য আমি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি এক ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (অর্থাৎ মৃত্যুর হালাত শুরু হইয়া যখন আলমে বরজখের দৃশ্য প্রকাশ হইয়া যায় তখন আর কাফেরের ঈমান কবুল হয় না।) -ছুরা নেছা, রুকুঃ ৩

উপরোক্ত আয়াতে এরশাদ করা হইয়াছে যে, যখন মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয় তখন আর তওবা কবুল হয় না। যেমন এই বিষয়টি সকলেরই জানা আছে যে, না দেখিয়া বিশ্বাস করার নামই 'ঈমান' সুতরাং তওবাও তখনই কবুল হয় যখন কোন কিছু না দেখিয়া গায়েবের উপর ঈমান ঠিক থাকে।

যখন কোন মানুষ নিজের শারীরিক ও আনুসঙ্গিক অবস্থা দ্বারা নিশ্চিতভাবে বুঝিতে পারে যে, অচিরেই সে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িবে, এখন আর তাহার বাঁচিয়া থাকার কোন সম্ভাবনাই নাই; তবে ঐ সময় যদি মৃত্যু কালীন অবস্থা বা আলমে বরজখের দৃশ্য প্রকাশ না পায় তবে তখনও তওবা এবং কাফেরের ঈমান কবুল হইবে। কিন্তু যখন মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং পরকালের দৃশ্যাবলী দেখা যাইতে থাকিবে তখন আর গোনাহ্‌গারের তওবাও কবুল হইবে না এবং কাফেরের ঈমানও কবুল করা হইবে না।

বয়ানুল কোরআনে লিখিত আছে যে, মোহাক্কেক ওলামাদের ধারণায় উপরোক্ত মতই সঠিক। এতদ্ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া হাদীসে পাকে উল্লেখ করা হইয়াছে-

إِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ

অর্থঃ রূহ গলদেশে আসিয়া আটকাইবার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ্ পাক বান্দার তওবা কবুল করেন। -মেশকাত।

রূহ যখন গলদেশে আসিয়া আটকাইয়া গরগর শব্দ করিতে শুরু করে ঐ সময় তওবা করিলে উহা কবুল হয় না। সুস্থ অবস্থায় অর্থাৎ সজ্ঞানে তওবা করিতে হইবে।

উপরে উদ্ধৃত يعملون السوء بجهالة আয়াতাংশের তরজমায় বয়ানুল কোরআনে লেখা হইয়াছে, "যাহারা বোকামিবশতঃ কোন পাপ করিয়া

ফেলে” এখানে ‘বোকামি’ অর্থ এল্‌মী বোকামি নহে বরং আমলী বোকামি উদ্দেশ্য। সুতরাং যেই ব্যক্তি গোনাহ্‌কে গোনাহ্‌ মনে করিয়াই গোনাহ্‌ করে তাহার তওবাও কবুল হইবে। অর্থাৎ এমন মনে করা যাইবে না যে, যেই ব্যক্তি জানিয়া–শুনিয়া গোনাহ্‌ করে তাহার তওবা কবুল হইবে না। অর্থাৎ কথিত ব্যক্তির এলেম ঠিকই আছে কিন্তু আমলের ক্ষেত্রে সে বোকামি করিতেছে। তওবা করিলে এমন ব্যক্তিও নাজাত পাইবে। আর গোনাহ্‌ সকল সময় বোকামির কারণেই হইয়া থাকে। কেহ যদি নিজের লাভ–লোকসান সম্পর্কে সচেতন না হয় তবে উহা হইতে বড় বোকামি আর কি হইতে পারে? ১

১। বয়ানুল কোরআনের প্রণেতা টীকায় উল্লেখ করেন যে, (উল্লেখিত আয়াতে) جهل এর অর্থ হইবে বোকামি, অজ্ঞতা নহে। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি গোনাহ জানা থাকা সত্ত্বেও কোন কাজ করে তথাপি তাহার তওবা কবুল হইবে এবং এই ক্ষেত্রে ‘বোকামি’ এই কারণে বলা হইবে যে, সে গোনাহের পরিণাম সম্পর্কে উদাসীন ছিল।

তাফসীরে রূহুল মায়ানীতে আব্দুর রাজ্জাক ও ইবনে জারীর হযরত কাতাদা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, এই ব্যাপারে ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-গণ একমত ছিলেন যে, নাফরমানীর প্রতিটি কাজই جهالة উহা ইচ্ছাকৃতভাবে করা হউক বা অনিচ্ছায় করা হউক।

তওবা ও এস্তেগফার দ্বারা পার্থিব উপকার

আয়াত—১৮

وَّاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِىْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ ۔

অর্থঃ আর এই (উদ্দেশ্যে) যে, তোমরা নিজেদের রবের নিকট হইতে গোনাহ্‌ মাফ করাও, তৎপর তাহার প্রতি নিবিষ্ট থাক, তিনি তোমাদিগকে সুখ–সম্ভোগ দান করিবেন নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত, এবং প্রত্যেক অধিক আমলকারীকে অধিক ছাওয়াব দিবেন। —ছুরা হুদ, রুকুঃ ১

উপরোক্ত আয়াতে তওবা ও এস্তেগফার করিতে আদেশ করিয়া বলা হইয়াছে যে, যাহারা তওবা ও এস্তেগফার করিবে, আল্লাহ্‌ পাক তাহাদিগকে দুনিয়াতে সুখ সম্ভোগ ও আরামের জীবন দান করিবেন এবং অধিক আমলকারীকে অধিক ছাওয়াব দান করিবেন।

আয়াত—১৯

وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ ۝

অর্থঃ আর হে আমার কওম! তোমরা নিজেদের পাপ নিজ রব হইতে ক্ষমা করাইয়া লও, অতঃপর তাহারই পানে নিবিষ্ট হও, তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন এবং তোমাদিগকে আরো শক্তি প্রদান করিয়া তোমাদের শক্তিকে বর্ধিত করিয়া দিবেন, আর পাপে লিপ্ত থাকিয়া মুখ ফিরাইয়া রাখিও না। —ছুরা হুদ, রুকুঃ ৫

উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত নসীহতটি হযরত হুদ আলাইহিস্‌সালামের যাহা তিনি স্বীয় কওমকে করিয়াছিলেন।

আয়াত—২০

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ۝ يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ

مِّدْرَارًا ۙ وَّيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّ
يَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ۝

অর্থঃ আর আমি বলিয়াছি যে, তোমরা স্বীয় রব কর্তৃক নিজেদের পাপ ক্ষমা করাইয়া লও; নিঃসন্দেহে তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল, তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন, এবং তোমাদিগকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা উন্নতি দিবেন, আর তোমাদের জন্য উদ্যানসমূহ রচনা করিবেন এবং তোমাদের জন্য নহরসমূহ প্রবাহিত করিয়া দিবেন। -ছুরা নূহ, রুকুঃ ১

স্বীয় কওমকে লক্ষ্য করিয়া বলা হযরত নূহ আলাইহিস্‌সালামের উক্তিসমূহ উপরোক্ত আয়াতগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে।

এই সকল আয়াত দ্বারা এই বিষয়েও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেল যে, তওবা ও এস্তেগফার দ্বারা গোনাহ্ মাফ হইয়া আখেরাতের কঠিন আজাব হইতে মুক্তি পাওয়ার পাশাপাশি দুনিয়াতেও উহা দ্বারা লাভবান হওয়া যায়।

১৮ নং আয়াতে এরশাদ করা হইয়াছে, তওবা ও এস্তেগফারে লাগিয়া থাকিলে আল্লাহ্ পাক এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (অর্থাৎ মৃত্যু আসার পূর্ব পর্যন্ত) সুখ সম্ভোগের জীবন দান করিবেন। "সুখ সম্ভোগের জীবন" কথাটির অর্থ ব্যাপক। মানব জীবনের যাবতীয় সুখ-শান্তি ইহার অন্তর্ভুক্ত। তওবা দ্বারা দুনিয়াতেই জাহেরী-বাতেনী, সুখ-শান্তি, নিরাপত্তা, শারীরিক সুস্থতা ও আত্মতৃপ্তি লাভ করা যাইবে। আর আখেরাতের ফায়দা ও বরকত তো আছেই।

১৯ নং আয়াতে বলা হইয়াছে যে, তওবা ও এস্তেগফার করিলে আল্লাহ্ পাক প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন এবং শক্তির মধ্যে আরো শক্তি বর্ধন করিয়া দিবেন। বৃষ্টি আল্লাহ্ পাকের একটি বিশেষ রহমত। উহার ব্যাপক উপকারিতা সম্পর্কে সকলেই অবগত। বৃষ্টি বর্ষণের ফলে জমিন উর্বর হইয়া ফসল উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়াও বৃষ্টির পানি দ্বারা মানুষ আরো বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়। আর আল্লাহ্ পাক যে বলিয়াছেন, শক্তির মধ্যে আরো শক্তি বৃদ্ধি করিবেন; এখানে শক্তি দ্বারা সকল প্রকার শক্তির কথাই বুঝানো হইয়াছে। অথচ মুসলমানগণ আজ এতটা দুর্বল ও শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে যে, দুনিয়ার সর্বত্র তাহারা দুশমনের হাতে মার খাইতেছে। আজকাল মুসলমানগণ পার্থিব সম্পদ সঞ্চয় করিয়া শক্তি বৃদ্ধি করিতে চায়। কিন্তু শক্তিবৃদ্ধির আসল উপায় কি? এই বিষয়ে তাহারা একেবারেই গাফেল। শক্তি বৃদ্ধির মূল উৎস হইল- যাবতীয় গোনাহ্ ত্যাগ করা এবং সেই সংগে তওবা এস্তেগফার করিতে থাকা। নেক আমল এবং তওবা ও এস্তেগফার দ্বারাই যে প্রকৃত শক্তি বৃদ্ধি ঘটে এই কথাটি যেন আজ সকলেই ভুলিয়া বসিয়াছে। পক্ষান্তরে তাহারা আজ অন্যায়-অপরাধ ও পাপের পথে শক্তির সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। অথচ যাবতীয় পাপকার্য হইল শক্তিক্ষয়ের অন্যতম কারণ। মানুষ যখন পাপ করিতে থাকে তখন ক্রমে সে শক্তিহীন হইয়া পড়ে। ফলে প্রতিপক্ষ ও শত্রুরা অনায়াসেই তাহাকে কাবু করিয়া ফেলে। আলোচিত আয়াতের ولا تتولوا مجرمين -এ এই বিষয়ের প্রতিই সতর্ক করিয়া বলা হইয়াছে, তওবা- এস্তেগফার কর, নেক আমল করিতে থাক এবং পাপ-পঙ্কিল জীবন যাপন করিও না।

২০নং আয়াতে এরশাদ করা হইয়াছে যে, তওবা ও এস্তেগফার করিলে আল্লাহ্ পাক গোনাহ্ ক্ষমা করিয়া দিবেন, সন্তান-সন্ততি দ্বারা উন্নতি দিবেন এবং নহরসমূহ প্রবাহিত করিয়া দিবেন। এখানে এমন দুইটি নেয়ামতের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে যাহা ১৮ ও ১৯ নং আয়াতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয় নাই। ঐ দুইটি নেয়ামত হইল, সন্তান-সন্ততি দ্বারা উন্নতি দান এবং নহর প্রবাহিত করিয়া দেওয়া। সকলেই জানেন যে, ইহা আল্লাহ্ পাকের বিরাট নেয়ামত। (অবশ্য ঐ দুইটি আয়াতে বর্ণিত "সুখ সম্ভোগ দান" এবং "তোমাদিগকে আরো শক্তি প্রদান করিয়া তোমাদের শক্তিকে বর্ধিত করিয়া দিবেন"- উক্তির মধ্যে ঐ দুইটি নেয়ামতও অন্তর্ভুক্ত বটে)।

তওবা এস্তেগফার দ্বারা পার্থিব জীবনেও লাভবান হওয়ার বিষয়টি পবিত্র কোরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। গোনাহ্-খাতা ত্যাগ করিয়া তওবা ও এস্তেগফারের মাধ্যমে উভয় জাহানের কামিয়াবী হাসিল করা আম-খাস ও রাজা-প্রজা সকলের জন্যই অবশ্য কর্তব্য।

উপরে তওবা ও এস্তেগফার সংক্রান্ত কালামে পাকের বিশটি আয়াত বর্ণনা করা হইল। পাঠকের সুবিধার্থে নিম্নে আমরা ঐ আয়াত সমূহের সারসংক্ষেপ উল্লেখ করিলাম।

আলোচিত আয়াত সমূহের সার সংক্ষেপ

১। আল্লাহ্ পাক তওবা করিতে আদেশ করিয়াছেন।

২। আল্লাহ্ পাক তওবা কবুল করেন এবং গোনাহ্সমূহ ক্ষমা করিয়া দেন, যাহা আখেরাতের কামিয়াবী ও নাজাতের উছিলা।

৩। আল্লাহ্ পাকের রহমত হইতে নিরাশ হইতে নিষেধ করা হইয়াছে। পরম দয়ালু আল্লাহ্ তা'য়ালার রহমত হইতে নিরাশ হওয়া মোমেনদের জন্য শোভন নহে।

৪। যদি বড় বড় গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকিয়া শরীয়তের জরুরী বিধানসমূহ পালন করা হয়, তবে আল্লাহ্ পাক ছোট ছোট গোনাহ্গুলি ক্ষমা করিয়া দেন।

৫। কৃত অপরাধ হইতে বিরত থাকা তওবা কবুলের পূর্বশর্ত।

৬। তওবা ও নেক আমলকারী ব্যক্তি সফলকাম।

৭। মৃত্যুর সময় যখন ভিন্ন জগতের দৃশ্যাবলি প্রকাশ হওয়া শুরু হয় তখন তওবা করিলে উহা কবুল হয় না। ঐ সময় কোন কাফের ঈমান আনিলে তাহাও কবুল হয় না।

৮। তওবা ও এস্তেগফার দ্বারা দুনিয়াতে সুখ সম্ভোগের জীবন লাভ হয় এবং–

৯। শক্তি বৃদ্ধি হয়।

১০। পর্যাপ্ত বৃষ্টি বর্ষণ হয়।

১১। সম্পদ ও সন্তানাদিতে উন্নতি হয়।

সুতরাং আল্লাহ্ পাকের ফরমান অনুযায়ী উভয় জাহানের কামিয়াবী ও উন্নতির জন্য তওবা ও এস্তেগফারে মনোনিবেশ করা আমাদের সকলের কর্তব্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এই অধ্যায়ে হাদীসে পাকের আলোকে তওবার হাকীকত, ফজিলত, গুরুত্ব এবং তওবার পদ্ধতি ও এতদ্সংক্রান্ত আনুসঙ্গিক বিষয়াদি আলোচনা করা হইয়াছে।

তওবার গুরুত্ব, ফজিলত এবং আল্লাহর দিকে রুজু হওয়া

হাদীস—১

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ وَاَنَا مَعَهٗ حَيْثُ يَذْكُرُنِىْ وَاللّٰهِ لَلّٰهُ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهٖ مِنْ اَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهٗ بِالْفَلَاةِ وَمَنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ بَاعًا وَاِذَا اَقْبَلَ اِلَىَّ يَمْشِىْ اَقْبَلْتُ اِلَيْهِ اُهَرْوِلُ

অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ্ পাক এরশাদ করিয়াছেন, আমার বান্দা আমাকে যেমন ধারণা করে আমি তেমন (অর্থাৎ বান্দা আমার সম্পর্কে যেইরূপ ধারণা করিবে আমি তাহার সহিত সেইরূপই আচরণ করিব।) এবং আমি বান্দার সঙ্গেই আছি যেখানেই সে আমাকে স্মরণ করিবে। (অতঃপর নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন) আল্লাহ্র শপথ! ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি জনশূণ্য প্রান্তরে তাহার সওয়ারী (বাহন) ও মাল ছামান হারাইয়া যাইবার পর পুনরায় উহা ফিরিয়া পাইলে যেই পরিমাণ খুশী হয়, আল্লাহ্ পাক তাহার কোন বান্দা তওবা করিলে উহা হইতেও অধিক খুশী হন। (আল্লাহ্ পাক আরো এরশাদ করেন) যেই ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয় আমি তাহার দিকে এক হাত অগ্রসর হই, আর যেই ব্যক্তি আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয় আমি তাহার দিকে চার হাত অগ্রসর হই। যখন সে আমার দিকে নিবিষ্ট হইয়া পায়ে হাটিয়া (সাধারণভাবে) অগ্রসর হয় তখন আমি তাহার দিকে দৌড়াইয়া (দ্রুত) অগ্রসর হই। —বোখারী ও মুসলীম।

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদীসে ঈমানদারদের জন্য কয়েকটি সুসংবাদ রহিয়াছে। প্রথমতঃ আল্লাহ্ পাক এরশাদ করিয়াছেন, "আমি আমার বান্দার ধারণা পরিমাণ।" সুতরাং সে যখন ধারণা করিবে এবং আশা পোষণ করিবে যে, আল্লাহ্ পাক নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং দুনিয়ার বালা-মুসীবত ও আখেরাতের আজাব হইতে রক্ষা করিবেন, তখন আল্লাহ্ পাক বান্দার ধারণা ও আশা অনুযায়ী নিশ্চয়ই তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। বান্দার ধারণা ও আশাকে কখনো তিনি ভঙ্গ করেন না।

আল্লাহ্ পাক কত বড় মেহেরবান। তাহার প্রতি সুধারণা ও আশা পোষণ করিতে বান্দার কোন কষ্ট হয় না, পয়সাও খরচ করিতে হয় না। অথচ এই বিনা শ্রমের সুধারণা ও আশার বিনিময়ে আল্লাহ্ পাক কত অনুগ্রহের সুসংবাদ দান করিয়াছেন। ইহার পরও কি আমরা আল্লাহ্র দিকে অগ্রসর হইব না? তবে এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, কোন প্রকার আমল না করিয়া শুধু রহমতের আশা করিলেই চলিবে না। নিয়মিত নেক আমলের পাশাপাশি যাবতীয় গোনাহ্ ও পাপাচার হইতে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। কেননা, অপর হাদীসে বলা হইয়াছে-

اَلْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ

অর্থঃ ঐ ব্যক্তি নির্বোধ, যে সর্বদা স্বীয় নফ্সানী খাহেশের পিছনে লাগিয়া থাকে আর আল্লাহ্ পাকের নিকট (রহমত) কামনা করে।

-তিরমিজি, ইবনে মাযা।

হাদীসে পাকে বর্ণিত দ্বিতীয় সুসংবাদটি হইল, বান্দা আমাকে যেখানেই স্মরণ করিবে আমি তাহার সঙ্গে আছি। বস্তুতঃ আল্লাহ্ পাকের "সঙ্গলাভ" যে কত বড় দৌলত উহা সেই ব্যক্তিগণই অনুভব করিতে পারিয়াছেন যাহাদের মুখ ও অন্তর সর্বদা আল্লাহ্ পাকের জিকিরে মশগুল রহিয়াছে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, আল্লাহ্ পাকের 'সঙ্গলাভ' হইতে বড় সম্পদ আর কিছুই হইতে পারে না।

দুনিয়াতে কাহারো সঙ্গে যদি একজন সাধারণ পুলিশও থাকে তবে উহার দাপটেই তাহার মনের জোর এত বাড়িয়া যায় যে, সে নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করিয়া ভাবিতে থাকে, এখন কেহ আমার অনিষ্ট করিতে চাহিলে এই

পুলিশ আমার সাহায্য করিবে। এক্ষণে ভাবিয়া দেখুন, দুনিয়ার একজন তুচ্ছ পুলিশের সঙ্গলাভের কারণেই যদি মানুষের অন্তরে এতটা নিরাপত্তা ও শক্তির সঞ্চার হইতে পারে তবে দুনিয়ার সকল শক্তির যিনি উৎস; সেই মহান রাব্বুলআ'লামীনের সঙ্গ পাইবার পর মানুষের মনের অবস্থা কেমন হইতে পারে?

তৃতীয় সুসংবাদের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে, যেই ব্যক্তি আল্লাহ্র দিকে সামান্য অগ্রসর হয় আল্লাহ্ পাক তাহার দিকে কয়েকগুণ বেশী অগ্রসর হন। অর্থাৎ বান্দাকে তিনি স্বীয় রহমতের ক্রোড়ে তুলিয়া লন।

চতুর্থ সুসংবাদে বলা হইয়াছে, আল্লাহ্ পাকের দিকে যদি কেহ স্বাভাবিক গতিতে অগ্রসর হয় তবে আল্লাহ্ পাক তাহার নিকট দ্রুত হাজির হন। কোন শিশু যখন নূতন নূতন হাঁটা শিখে, তখন তাহাকে দাঁড় করাইয়া হাত পাতিয়া নিকটে আহবান করিলে সে যেই মাত্র উঠি-পড়ি করিয়া দুই-এক কদম অগ্রসর হয়; সঙ্গে সঙ্গে আহবানকারী ছুটিয়া আসিয়া শিশুকে কোলে টানিয়া লইয়া বাহবা দিতে থাকে। (আসলে আল্লাহ্ পাক হাঁটা, চলা-ইত্যাদি বিষয় হইতে পবিত্র। নিজের বান্দার প্রতি তিনি যে কতটা মেহেরবান এবং গোনাহ্গার বান্দাগণ আল্লাহ্র পথে সামান্য অগ্রসর হইলে তিনি যে তাহাদের প্রতি কতটা রহমত ও অনুগ্রহ বর্ষণ করেন, এই সকল বিষয় বুঝাইবার জন্যই বিঘত, হাত এবং হাঁটা-চলা ইত্যাদি শব্দসমূহ ব্যবহার করা হইয়াছে।)

সুতরাং হে মোমেনগণ! আল্লাহ্র দিকে অগ্রসর হইতে থাকুন। তাহার রহমত হইতে কখনো নিরাশ হইতে নাই। সর্বদা তাহাকে স্মরণ করুন এবং তওবা ও এস্তেগফার করিতে থাকুন। উপরোক্ত হাদীসে ইহাও এরশাদ হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি জনমানবশূণ্য কোন বিরান ভূমিতে নিজের সওয়ারী, মাল-ছামান ও খাদ্য-সামগ্রী হারাইয়া ফেলিল। অতঃপর সে বহু খোঁজা-খুঁজি করিয়াও উহার সন্ধান করিতে না পারিয়া একেবারেই নিরাশ হইয়া ভাবিতে লাগিল যে, এখন তাহার নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিবার আর কোন উপায় নাই। এই কঠিন দুর্ভাবনার মুহূর্তে হঠাৎ যদি সে তাহার সওয়ারীসহ হারাইয়া যাওয়া সকল মাল-ছামান ফিরিয়া পায় তবে ঐ ব্যক্তির মনে যে কতটা আনন্দের সঞ্চার হইতে পারে তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার মত নহে। ঠিক তেমনি কোন বান্দা যখন আল্লাহ্ পাকের দরবারে তওবা করে তখন তিনি ঐ ব্যক্তির আনন্দ হইতেও আরো অধিক আনন্দিত হন।

পশ্চিম দিক হইতে সূর্য উদয় হইবার পূর্ব পর্যন্ত তওবার দরজা খোলা থাকিবে

হাদীস—২

وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ
مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى
تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا۔

অর্থঃ হযরত আবু মূছা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক প্রতি রাতে হস্ত প্রসারিত করেন বিগত দিনের গোনাহ্গারদের তওবা কবুল করার জন্য। এমনিভাবে দিনের বেলা নিজের হাত প্রসারিত করেন বিগত রাতের গোনাহ্গারদের তওবা কবুল করার জন্য। পশ্চিম দিক হইতে সূর্য উদয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত (প্রতি রাতে ও দিনে) ইহা অব্যাহত থাকিবে। —মুসলিম, নাছাই।

ব্যাখ্যাঃ হস্ত প্রসারিত করিবার অর্থ হইল, আল্লাহ্ পাক স্বীয় বান্দাদের প্রতি খাছ তাওয়াজ্জুহ্ ও বিশেষ দৃষ্টি দান করেন। আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত দয়ালু ও ক্ষমাশীল। গোনাহ্গার বান্দা যখনই তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তখনই তিনি উহা কবুল করেন।

উপরে হাদীসের তরজমায় বলা হইয়াছে, "পশ্চিম দিক হইতে সূর্য উদয় হইবার পূর্ব পর্যন্ত ইহা অব্যাহত থাকিবে।" অর্থাৎ তওবাকারীদের তওবা কবুল হইতে থাকিবে। ইহার ব্যাখ্যা হইল, কেয়ামতের পূর্বে সূর্য পশ্চিম দিক হইতে উদয় হইবে, উহাই কেয়ামত নিকটবর্তী হইবার বড় নিদর্শন। ঐ নিদর্শন প্রকাশ পাইবার পূর্বে যাহারা গোনাহ্ করিয়াছে কিন্তু তওবা করে নাই; এক্ষণে আর তাহাদের তওবা কবুল হইবে না।

এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক তওবা কবুলের জন্য পশ্চিম দিকে একটি দরজা বানাইয়াছেন। যাহার প্রস্থ সত্তর বছরের দূরত্বের সমান। পশ্চিম দিক হইতে সূর্য উদয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ঐ দরজা বন্ধ হইবে না।

এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে—

يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ
آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا۔

অর্থঃ যেদিন আপনার প্রতিপালকের বড় নিদর্শন আসিয়া পৌছিবে (সেদিন) কোন এইরূপ ব্যক্তির ঈমান তাহার কাজে আসিবে না, যে ব্যক্তি পূর্ব হইতে ঈমানদার ছিল না, অথবা (ঈমানদার তো ছিল, কিন্তু) সে স্বীয় ঈমানের মধ্যে কোন সৎকাজ করে নাই। —তিরমিযি, ইবনে মাজা।

গোনাহের পরিমাণ যত বেশীই হউক তওবা করিলে ক্ষমা করা হইবে

হাদীস—৩

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا ابْنَ
آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ
فِيكَ وَلَا أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ
ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ أَتَيْتَنِي
بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ
بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً

অর্থঃ হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ্ পাক এরশাদ করিয়াছেন, হে আদম সন্তান! যতক্ষণ তুমি আমার নিকট দোয়া করিতে থাকিবে আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিব, তোমার গোনাহের পরিমাণ যত বেশীই হউক তাহাতে আমি কিছুমাত্র পরোয়া করিব না। হে আদম সন্তান! তোমার গোনাহ্ যদি আকাশের মেঘ পরিমাণও হয় তথাপি তুমি আমার নিকট মাগফেরাত কামনা করিলে আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিব। আর তাহাতে আমি কোন

কিছুই পরোয়া করিব না। হে আদম সন্তান! তোমার গোনাহ্ যদি এত বিপুল পরিমাণ হয় যে, উহা দ্বারা গোটা জমিন ভরিয়া যায়; ঐ অবস্থায়ও যদি তুমি আমার নিকট এমনভাবে হাজির হও যে, আমার সহিত কাহাকেও তুমি শরীক কর নাই, তবে আমিও তোমাকে এত বিপলু পরিমাণ মাগফেরাত দ্বারা ধন্য করিব যে, উহা দ্বারাও গোটা ভূপৃষ্ঠ পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। -তিরমিযি।

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদীসে পাকে রাব্বুলআলামীনের পক্ষ হইতে মোমেন বান্দাদের জন্য একটি সাধারণ ঘোষণা প্রকাশ করা হইয়াছে। মানুষের দ্বারা সাধারণতঃ সকল সময়ই কিছু না কছিু ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতেই থাকে। শরীয়তের হুকুম পালন ও নিয়মিত আমলে শিথিলতা এবং অজ্ঞতা ও অবহেলার কারণে ছোট বড় গোনাহ্ তাহাদের দ্বারা অহরহই প্রকাশ পাইতে থাকে। সুতরাং মহান গাফুরুর রাহীম আল্লাহ্ পাকও বান্দার মাগফেরাতের সহজ উপায় বয়ান করিয়া দিয়াছেন। বান্দা যখন নেহায়েত আজেজী-এন্‌কেছারী ও অনুতাপ-অনুশোচনায় বিদগ্ধ মন লইয়া মাগফেরাতের দৃঢ় আশায় আল্লাহ্ পাকের দরবারে নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং "ভবিষ্যতে আর কখনো এই ধরনের অপরাধ হইবে না" এই মর্মে দৃঢ় অঙ্গীকার করে তখন আল্লাহ্ পাক বান্দাকে ক্ষমা করিয়া দেন। এই প্রসঙ্গে তাহার ঘোষণা হইল- لا أبالي -বান্দার গোনাহ্ ক্ষমা করিয়া দেওয়া আমার জন্য কোন বোঝা নহে, এই বিষয়ে আমার কোন অপারগতা ও পরোয়া করার প্রয়োজন নাই। বড় গোনাহ্ ক্ষমা করাও আমার জন্য কোন মুশকিল নহে এবং ছোট গোনাহ্ ক্ষমা করিতেও আমার কোন বাঁধা নাই।

বিপুল পরিমাণ পাপের দুইটি উদাহরণ উল্লেখ করিয়া মোমেন বান্দাগণকে সান্ত্বনা দিয়া এরশাদ করা হইয়াছে- তোমাদের গোনাহ্ যদি এই পরিমাণও হয় যে, উহাকে যদি দেহের আকার প্রদান করা হয় তবে জমিন-আসমান এবং উহার মধ্যকার গোটা শূণ্য স্থান উহা দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে, তবুও আমার নিকট ক্ষমা চাহিলে আমি ক্ষমা করিয়া দিব। আর তোমাদের গোনাহের পরিমাণ যদি এমন হয় যে, উহা দ্বারা ভূপৃষ্ঠ ভরিয়া যাইবে তথাপি আমি উহা ক্ষমা করিয়া দিতে সক্ষম। আর আমি সকলকেই ক্ষমা করিয়া থাকি। তোমাদের গোনাহ্ যদি জমিনকে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারে তবে আমার [illegible] গোটা ভূপৃষ্ঠকে ভরিয়া ফেলি[illegible] পারিবে। বরং আল্লাহ্ পাকের

মাগফেরাত এত অসীম যে, গোটা আসমান ও জমিনের বিশাল ভাণ্ডারও ঐ অন্তহীন মাগফেরাতের সামনে কিছুই নহে। ১ কিন্তু কাফের ও মুশরিকদিগকে ক্ষমা করা হইবে না।

১। হাকিমুল উম্মত হযরত থানভী (রহঃ) এর খলীফা করাচীর ডাঃ আব্দুল হাই (রহঃ) বলিতেন, করাচী শহরের কোটি কোটি মানুষের মল-মূত্র নর্দমা পথে সমুদ্রে যাইয়া পতিত হয়। অতঃপর সমুদ্রের একটি তরঙ্গ আসিয়া উহাকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। মুহূর্তে সেখানে নাপাকীর চিহ্নমাত্র থাকে না। সমুদ্র আল্লাহ্ পাকের একটি ক্ষুদ্র সৃষ্টি। এই ক্ষুদ্র সৃষ্টির একটিমাত্র তরঙ্গের মধ্যেই এত শক্তি রহিয়াছে যে, এক মুহূর্তে কোটি কোটি মানুষের নাপাক ময়লা এমনভাবে পাক-ছাফ করিয়া দেয় যে, অতঃপর কোন ইমাম সেই পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করিয়া নামাজ পড়াইলে তাহাও শুদ্ধ হইয়া যায়। এক্ষণে ভাবিয়া দেখুন, আল্লাহ্ পাকের ক্ষুদ্র সৃষ্টি সমুদ্রের একটি তরঙ্গের মধ্যেই যদি এত শক্তি থাকে তবে স্বয়ং আল্লাহ্ পাকের রহমতের অন্তহীন সমুদ্রের তরঙ্গ কি আমাদের গোনাহ্-খাতাকে ধুইয়া-মুছিয়া পরিষ্কার করিতে পারিবে না?

অনেককেই বলিতে শোনা যায় যে, আমি বার বার তওবা ভঙ্গ করিতেছি, আল্লাহ্ কি আমাকে ক্ষমা করিবেন? আমার গোনাহ্ ক্ষমার যোগ্য নহে। এইরূপ ব্যক্তিকে দৃশ্যতঃ মনে হয় যেন স্বীয় অপরাধের অনুভূতিতে তাহার মধ্যে যথার্থ অনুশোচনা সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু মওলানা থানভী (রহঃ) বলেন, বাহ্যতঃ তাহাকে বিনয়ী মনে হইলেও প্রকৃত পক্ষে সে বড় অহংকারী বটে। কারণ সে নিজের অপরাধের তুলনায় আল্লাহ্ পাকের অফুরন্ত রহমতের ভাণ্ডারকে তুচ্ছ মনে করিতেছে। সে যেন ইহাই প্রমাণ করিতে চাহিতেছে যে, আল্লাহ পাকের রহমত তাহার গোনাহ্‌কে ক্ষমা করিতে সক্ষম নহে। এই প্রসঙ্গে মওলানা থানভী (রহঃ) একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলেন, একদা এক মশা এক ষাঁড়ের শিং-এর উপর বসিয়াছিল। উড়িয়া যাওয়ার সময় সে ষাঁড়কে লক্ষ্য করিয়া বলিল, তোমার অনুমতি ছাড়া আমি তোমার শিং-এর উপর বসিয়াছিলাম, তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়া দিও। ষাঁড় জবাবে বলিল, তুমি যদি না বলিতে তবে তুমি কখন আসিলে আর কখন চলিয়া গেলে আমি কিছুই টের পাইতাম না। এই ঘটনা বর্ণনা করিয়া মওলানা থানভী (রহঃ) বলেন, বান্দার সমুদ্র পরিমাণ গোনাহ্ও আল্লাহ্ পাকের রহমতের সামনে কিছুই নহে।

-(হাকিম মওলানা আখতার সাহেবের রচিত "ফাজায়েলে তওবা" হইতে সংগৃহীত -অনুবাদক)।

এই কারণেই হাদীসের শেষাংশে মাগফেরাতের শর্ত হিসাবে আল্লাহ্ পাকের সহিত কোন কিছু শরীক না করার বিষয়টি উল্লেখ করা হইয়াছে।

কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ۚ

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁহার সহিত শরীক স্থির করার অপরাধ ক্ষমা করিবেন না, এবং ইহা ব্যতীত অন্যান্য পাপ তিনি যাহাকে উচ্ছা ক্ষমা করিয়া দিবেন।

কাফের ও মুশরিকদিগকে কখনো ক্ষমা করা হইবে না। তাহারা চিরদিন দোজখেই শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে। মোমেন বান্দাদের দ্বারা যত অধিক পরিমাণেই গোনাহ্ হউক আল্লাহ্ পাকের রহমত ও মাগফেরাত হইতে কখনো নিরাশ হইতে নাই। "আল্লাহ্ পাক ক্ষমা করিয়া দিবেন" এই দৃঢ় আশা লইয়া সর্বদা তওবা ও এস্তেগফারে লাগিয়া থাকা উচিৎ।

আল্লাহর ক্ষমাগুণ

হাদীস–৪

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَوْلَمْ تُذْنِبُوْا لَذَهَبَ اللّٰهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُوْنَ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ পবিত্র জাতের কসম! যাহার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা যদি গোনাহ্ না কর তবে আল্লাহ্ পাক তোমাদিগকে এই দুনিয়া হইতে স্থানান্তর করিয়া অন্য এক কওমকে সৃষ্টি করিবেন। যাহারা গোনাহ্ করিয়া আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে আর আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। –মুসলিম।

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ্ পাক বান্দার প্রতি কত বড় ক্ষমাশীল, আলোচিত হাদীসে

উহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। 'কাহ্হার' ও 'জাব্বার' যেমন তাহার খাছ ছিফাত; ঠিক তেমনি 'গাফ্ফার' ও 'ছাত্তার'ও তাহার খাছ ছিফাত। প্রকৃত অপরাধীকে শাস্তি দানের ব্যাপারে তিনি যেমন কঠোর, ঠিক তেমনি বান্দার অপরাধ গোপন করা এবং ক্ষমা করিয়া দেওয়ার ব্যাপারেও তিনি অত্যন্ত মেহেরবান। সৃষ্ট জীবের উপর বিভিন্ন উপায়ে আল্লাহ্ পাকের গুণ ও ছিফাতের বিকাশ ঘটিতে থাকে। কেহ অপরাধ করিয়া যখন আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে তখন তাহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিলেই তিনি যে গাফ্ফার ও 'ক্ষমাশীল' তাঁহার এই ছিফাতটি প্রকাশ পাইবে। তাঁহার এই গাফ্ফারিয়াতের শানের উল্লেখ করিয়াই হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছে, তোমরা যদি গোনাহ্ না কর তবে আল্লাহ্ পাক তোমাদের স্থানে অপর এক কওম সৃষ্টি করিবেন যাহারা অপরাধ করিয়া আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। আর আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।

তওবাকারী নিষ্পাপ হইয়া যায়

হাদীস–৫

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهٗ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাজিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তওবাকারী ঐ ব্যক্তির ন্যায় যাহার কোন গোনাহ্ নাই। –তাবরানী।

ব্যাখ্যাঃ আলোচিত হাদীসে বলা হইয়াছে, তওবা করার পর মানুষ এমন হইয়া যায় যেন সে কখনো পাপই করে নাই। অর্থাৎ যেই ব্যক্তি তওবা করিল আর যেই ব্যক্তি জীবনে কখনো কোন গোনাহ্ করে নাই– পাপের শাস্তির ব্যাপারে তাহারা উভয়ই সমান। অর্থাৎ তাহাদের কাহারো কোন শাস্তি হইবে না। তবে হাঁ, তওবার যাবতীয় শর্তসহ খাঁটি নিয়তে তওবা করিতে হইবে। (তওবার যাবতীয় আয়োজন ও শর্তসমূহ ১৮ ও ১৯ নং হাদীসে আলোচনা করা হইয়াছে)।

মোমেনের দ্বারা গোনাহ্ হওয়া অসম্ভব নহে, তবে সে সঙ্গে সঙ্গেই তওবা করিয়া নেয়

হাদীস—৬

وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَالْاِيْمَانِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِىْ اٰخِيَّتِهٖ يَجُوْلُ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى اٰخِيَّتِهٖ وَاِنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْهُوْ ثُمَّ يَرْجِعُ فَاَطْعِمُوْا طَعَامَكُمُ الْاَتْقِيَاءَ وَاَوْلُوْا مَعْرُوْفَكُمُ الْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থঃ হযরত আবু ছাইদ আল খুদরী রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, মোমেনের উদাহরণ এবং ঈমানের উদাহরণ এইরূপ যেমন কোন ঘোড়াকে তাহার নিজের জায়গায় বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে (অর্থাৎ তাহার পায়ে একটি লম্বা রশি লাগানো আছে, ঐ রশি যেই পরিমাণ লম্বা ঐ পরিমাণ দূরত্ব পর্যন্ত) সে ঘোরাফিরা করে, অতঃপর পুনরায় নিজের জায়গায় ফিরিয়া আসে। (ঠিক এমনিভাবে) মোমেন ব্যক্তি ঈমানের দাবী ও চাহিদা হইতে দূরে সরিয়া) গাফেল হইয়া যায় (অপরাধ করিয়া ফেলে)। অতঃপর পুনরায় ঈমানের (দাবীর) দিকে ফিরিয়া আসে। সুতরাং তোমরা নিজেদের আহার মোত্তাকী লোকদিগকে খাওয়াইবে এবং নিজেদের দানসমূহ মোমেনগণকে প্রদান করিবে।[১]

—ইবনে মাজা, বায়হাকী, আবু নাঈম নোয়াইম।

১। ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলেন, ঈমানের জন্য গোনাহ্ এমন, যেমন দেহের জন্য ক্ষতিকর খাদ্য। ক্ষতিকর খাদ্য পাকস্থলীতে একত্রিত হইয়া আস্তে আস্তে পিত্তাদির মেজাজ বিগড়াইতে থাকে, যাহা মানুষ টের পায় না। অতঃপর হঠাৎ সে রুগ্ন হইয়া মৃত্যুবরণ করে। গোনাহ্ ঈমানের মধ্যে এমনিভাবে প্রভাব বিস্তার করে এবং এক দিন ঈমানকেই ডুবাইয়া দেয়। সুতরাং ধ্বংসশীল দুনিয়াতে মৃত্যুর ভয়ে যখন বিষাক্ত ও ক্ষতিকর খাদ্য না খাওয়া তাৎক্ষণিক ওয়াজিব, তখন চিরন্তন ধ্বংসের ভয়ে ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম না করা আরও উত্তমরূপে তাৎক্ষণিক ওয়াজিব হইবে। বিষপানকারী স্বীয় ভুলের জন্য অনুতপ্ত হইয়া যেমন তৎক্ষণাৎ উদরকে বিষমুক্ত করার জন্য বমি করিতে অথবা অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে সচেষ্ট

হাদীস—৭

وَعَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ ابْنِ اٰدَمَ خَطَّاءٌ وَّخَيْرُ الْخَاطِئِيْنَ التَّوَّابُوْنَ

অর্থঃ হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, সকল মানুষই গোনাহ্গার, তবে গোনাহ্গারদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি যে অধিক তওবা করে।

—তিরমিযি, ইবনে মাজা, মুসতাদরাকে হাকিম।

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, মোমেনের দ্বারা গোনাহ্ হওয়া কোন আশ্চর্যের বিষয় নহে। তবে হাঁ, বার বার একই গোনাহ্ করা মোমেনের শান নহে। কখনো কোন গোনাহ্ হইয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে সে তওবা করিয়া ঈমানের দাবী অনুযায়ী নেক আমলে লাগিয়া যাইবে। একগুঁয়েমি ও জিদ করিয়া অবাধ্য হইবে না। কারণ, ইহা বরবাদীর লক্ষণ।

৬নং হাদীসে বর্ণিত "নিজেদের আহার মোত্তাকী লোকদিগকে খাওয়াইবে এবং নিজেদের দানসমূহ মোমেনদেরকে প্রদান করিবে" দ্বারা এই কথাই বুঝানো হইয়াছে যে, নেককার, ছালেহীন ও ঈমানদারদের সহিত সম্পর্ক স্থাপন কর এবং তাহাদের সঙ্গেই উঠা বসা, চলা-ফিরা ও লেন-দেন কর যেন আখেরাতের প্রতি মনোযোগী হওয়ার ব্যাপারে পরস্পরের সহযোগিতা পাওয়া যায় আর তোমাদের সম্পদ ফাসেক ও গোনাহ্গারদের জন্য খরচ না করিয়া ঐ সকল লোকদের জন্য খরচ করিবে যাহারা আল্লাহ্র জন্যই জীবন ধারণ করে এবং আল্লাহ্র জন্যই মৃত্যুবরণ করে।

✡

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ

হয়, তেমনিভাবে যে গোনাহ্ করে, তাহার জন্য গোনাহ্ হইতে তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসা ওয়াজিব। অতঃপর যতদিন সে জীবিত থাকে, ততদিন এই ক্ষতিপূরণ করিতে সচেষ্ট হইবে। সুতরাং গোনাহ্গারের উচিৎ দ্রুত তওবার প্রতি মনোনিবেশ করা। নতুবা গোনাহের বিষক্রিয়ার ফলে ঈমানের আত্মা প্রভাবিত হইয়া যাইবে।

—এহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন হইতে সংগৃহিত। —অনুবাদক

গোপন পাপের তওবা গোপনে এবং প্রকাশ্য পাপের তওবা প্রকাশ্যে করিতে হইবে

হাদীস—৮

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْصِنِيْ قَالَ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ مَا اسْتَطَعْتَ وَاذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَّشَجَرٍ وَّمَا عَمِلْتَ مِنْ سُوْءٍ فَاَحْدِثْ لَهُ تَوْبَةً اَلسِّرَّ بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةَ بِالْعَلَانِيَةِ

অর্থঃ হযরত মু'আজ রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাকে বিশেষ কিছু নসীহত করুন। এরশাদ হইল, তুমি নিজের শক্তি—সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সকল পাথর ও বৃক্ষের নিকট (অর্থাৎ সর্বত্র) আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর। আর যতবারই কোন গোনাহ্ করিবে নূতনভাবে উহার জন্য তওবা করিবে। গোপন গোনাহের জন্য গোপনে এবং প্রকাশ্য গোনাহের জন্য প্রকাশ্যে তওবা করিবে। —তাবরানী।

ব্যাখ্যাঃ উক্ত হাদীসে কয়েকটি অসীয়ত বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমতঃ বলা হইয়াছে যে, তোমরা খোদা ভীতি বা তাক্‌ওয়া এখ্‌তিয়ার কর। বস্তুতঃ তাক্‌ওয়া বা খোদা—ভীতি মানব চরিত্রের এমন একটি গুণ যাহা মানুষকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ছোট—বড় যাবতীয় গোনাহ্ হইতে দূরে রাখে। যেই ব্যক্তি তাক্‌ওয়া হাসিল করিয়াছে সে আল্লাহ্ পাকের খাছ বান্দায় পরিণত হইয়াছে। কালামে পাকের বিভিন্ন স্থানে তাক্‌ওয়া হাসিল করার হুকুম করা হইয়াছে। কেননা তাক্‌ওয়ার মাধ্যমেই সকল আমল জিন্দা হয়। এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে—

عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ فَاِنَّهُ اَزْيَنُ لِاَمْرِكَ كُلِّهِ ـ

অর্থঃ তোমরা তাক্‌ওয়া এখতিয়ার কর। উহা দ্বারা তোমাদের সকল আমলের সৌন্দর্য আসিবে।

মানুষের মধ্যে যখন তাক্‌ওয়া হাসিল হইবে তখন তাহার দ্বীনী আমলসমূহও যথাযথভাবে আদায় হইবে এবং দুনিয়াবী কাজ—কর্ম ও আয়—উপার্জনেও সে আল্লাহ্‌কে ভয় করিয়া হক ও হালাল পথে চলিতে থাকিবে। মানুষ যখন জানিতে পারিবে যে, এই ব্যক্তির তাক্‌ওয়া ও পরহেজগারী হাসিল হইয়াছে, সকল কাজেই সে আল্লাহকে ভয় করিয়া চলে তখন সকলেই তাহার অনুরক্ত হইয়া পড়িবে।

হাদীসে বর্ণিত দ্বিতীয় নসীহতটি হইল, সকল পাথর ও বৃক্ষের নিকট (অর্থাৎ সদা সর্বদা ও সর্বত্র) আল্লাহ্‌র জিকির কর। এই নসীহতটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। "জিকিরে এলাহী" নামে আমার একটি কিতাব ছাপা হইয়াছে। উহাতে জিকিরের উপকারিতা ও ফাজায়েল সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে।

তৃতীয় নসীহতটি হইল, যখনই কোন গোনাহ্ হইয়া যাইবে উহার জন্য নূতনভাবে তওবা করিয়া লইবে। ইতিপূর্বে যতবার তওবা করা হইয়াছে উহার ছাওয়াব, বরকত এবং উহা দ্বারা ক্ষমা প্রাপ্তির উপকারিতা ইত্যাদি তো আছেই; উহার পরও যখনই কোন গোনাহ্ হইয়া যাইবে সঙ্গে সঙ্গে তওবা করিয়া লইবে। তওবা করিতে কখনো বিলম্ব বরিবে না। এমন ধারণা করিবে না যে, পরে এক সময় তওবা করিয়া লইব। পরে সময় পাইবে কি—না উহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কে কত সময় বাঁচিয়া থাকিবে এবং মৃত্যু কখন আসিয়া হাজির হইবে উহা কেহই বলিতে পারে না। বিলম্ব করিলে জীবনে তওবার সুযোগ নাও হইতে পারে। তওবার ব্যাপারে নফস্ গড়িমসি করাইতে চাহিলে সেদিকে কান দিবে না।

তওবার ব্যাপারে আলোচিত হাদীসে অপর যেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে উহা হইল, যেই গোনাহ্ গোপনে করা হইয়াছে উহার তওবাও গোপনেই করিতে হইবে, অপর কাহারো নিকট ইহা প্রকাশ করিবে না যে, আমি অমুক অপরাধ করিয়াছি। এমনিভাবে যেই গোনাহ্ প্রকাশ্য জনসম্মুখে করা হইয়াছে উহার তওবাও প্রকাশ্যে সকলের সম্মুখে করিতে হইবে। যেমন কেহ মুর্খতা বশতঃ প্রকাশ্যে এই কথা বলিয়া ফেলিল যে, যাহার ঘরে খাবার নাই সে—ই রোজা রাখিবে। ইহা পরিষ্কার কুফরী কালাম। কেননা এখানে সে দ্বীনের এক মজবুত ভিত্তি রোজাকে ব্যঙ্গ করিয়াছে। সুতরাং এই

কুফরী কর্ম যদি কেহ গোপনে করিয়া থাকে তবে তাহাকে গোপনেই তওবা করিতে হইবে। আর যদি সকলের সামনে করিয়া থাকে তবে তওবাও সকলের সামনেই করিতে হইবে। এইভাবে তওবা করিলে তওবার একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত অর্থাৎ "প্রকাশ্য অপরাধের তওবা প্রকাশ্যে" করার বিধানটি পালন করা হইবে। ফলে লোকেরাও তাহার তওবার সাক্ষী হইয়া যাইবে।

কোন মুসলমানকে বিশেষতঃ কোন আলেমকে যদি সকলের সম্মুখে প্রকাশ্যে অপমান করা হয় তবে এই ক্ষেত্রে অপরাধীকে সকলের সম্মুখেই ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে। ফলে একদিকে যেমন অপরাধীর নফ্সের এছলাহ্ হইবে, অপর দিকে যাহাদের সম্মুখে আলেমের মানহানি করা হইয়াছিল তাহাদের সম্মুখেই পুনরায় তাহার ইজ্জত ও একরাম করা হইবে। অথচ অনেক সময় দেখা যায়, কোন সম্মানী ব্যক্তিকে হয়ত সকলের সম্মুখেই গাল-মন্দ করিয়া অপমান করা হইল; পরে হয়ত সকলের অগোচরে তাহার নিকট ক্ষমা চাওয়া হইল। এই ধরনের ক্ষমা চাওয়া দ্বারা ঐ অপমানের ক্ষতিপূরণ হয় না যাহা সকলের সম্মুখে করা হইয়াছে।

নেক আমলই বদ আমলের কাফ্ফারা

হাদীস-৯

وَعَنْ اَبِيْ ذَرٍّ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ۔

অর্থঃ হযরত আবু জর এবং হযরত মু'আজ বিন জাবাল রাজিয়াল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তুমি যেখানেই থাক আল্লাহ্কে ভয় কর এবং বদ আমলের পরে নেক আমল কর; এই নেক আমল ঐ বদ আমলকে মিটাইয়া দিবে। আর মানুষের সহিত ভাল ব্যবহার কর। -তিরমিযি।

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদীসে তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথমতঃ যদি

কোন গোনাহ্ হইয়া থাকে তবে উহার পরই নেক আমলে ব্রতী হও। এই নেক আমল ঐ গোনাহের জন্য মাগফেরাত ও কাফ্ফারা হইয়া যাইবে। কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে-

اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ

অর্থঃ নিঃসন্দেহে সৎকার্যাবলী মুছিয়া ফেলে মন্দ কার্যসমূহকে।

ইহাও আল্লাহ্ পাকের বিশেষ দান যে, নেক আমল দ্বারা তিনি গোনাহ্ ক্ষমা করিয়া দেন। অনেক হাদীসে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, যখন কোন বান্দা অজু করে তখন তাহার চক্ষু, হাত, পা, চেহারা, মাথা ও কান হইতে পাপসমূহ ঝরিয়া পড়ে। -ছহী মুসলিম, মোয়াত্তা ইমাম মালেক।

হযরত ওসমান রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন মুসলমানের সম্মুখে যখন ফরজ নামাজ হাজির হয় (অর্থাৎ নামাজের সময় হয়) আর সে নামাজের জন্য উত্তমরূপে অজু করে এবং যথাযথভাবে নামাজের রুকু সেজদাসমূহ আদায় করে তবে এই নামাজ তাহার বিগত জীবনের গোনাহের কাফ্ফারা হইয়া যাইবে, যতক্ষণ না সে কোন কবীরা গোনাহ্ করে। আর গোনাহের এই কাফ্ফারা এইরূপেই অব্যাহত থাকিবে।[১] -ছহীমুসলিম।

এক হাদীসে আছে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এবং এক জুমুআ হইতে আরেক জুমুআ পর্যন্ত এবং এক রমজান হইতে অন্য রমজান পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ের গোনাহ্ সমূহের জন্য কাফ্ফারা হইয়া যায়- যদি কবীরা গোনাহ্ হইতে সে বাঁচিয়া থাকে।[২] -মুসলিম।

১। ওলামায়ে কেরামের মতে উল্লেখিত হাদীস এবং এই ধরনের অন্যান্য হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নেক আমল গোনাহের কাফ্ফারা স্বরূপ। সুতরাং কাহারো আমলনামায় যদি ছগীরা গোনাহ্ থাকে তবে নেক আমল দ্বারা উহার কাফ্ফারা হইয়া যাইবে। আর যদি ছগীরার পরিবর্তে কবীরা গোনাহ্ থাকে তবে আমাদের আশা এই যে, আল্লাহ্ উহাকে শিথিল করিয়া দিবেন। পক্ষান্তরে আমলনামায় যদি ছগীরা, কবীরা কোন প্রকার গোনাহ্ না থাকে তবে সেই ক্ষেত্রে নেক আমল দ্বারা তাহার আমল নামায় নেকী লেখা হইবে এবং তাহার দরজা বুলন্দ হইতে থাকিবে। -মেরকাত ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৫।

২। গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকার অর্থ হইল, সামর্থ্য ও ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বাঁচিয়া থাকা। উদাহরণতঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন নারীর সাথে যিনা করিতে সক্ষম হয় এবং মনে আগ্রহও

নেক আমল দ্বারা গোনাহের কাফ্ফারা হওয়ার ব্যাখ্যায় হক্কানী ওলামাগণ বলিয়াছেন, ঐ গোনাহ্ দ্বারা ছগীরা গোনাহ্ বুঝানো হইয়াছে। আসলে ছগীরা গোনাহ্ মাফ হইয়া যাওয়াও কম কথা নহে। সাধারণতঃ মানুষের দ্বারা ছাগীরা গোনাহ্ই বেশী হইয়া থাকে। আল্লাহ্ পাক বান্দার নেক আমলের দ্বারাই এই সকল গোনাহ্ ক্ষমা করিয়া দেওয়ার এন্তেজাম করিয়াছেন। আলেমগণ বলিয়াছেন, বান্দার ছগীরা গোনাহ্ যদি একেবারেই নগণ্য হয় তবে তাহার নেক আমল দ্বারা কবীরা গোনাহ্কেও কিছুটা শিথিল করা হয় এবং ঐ নেক আমলের ফলে তাহার দরজা বুলন্দ হইতে থাকে।

গোনাহের কারণে মনে ভীতি সৃষ্টি হওয়া চাই

হাদীস—১০

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: وَاذُنُوبَاهُ! وَاذُنُوبَاهُ! فَقَالَ هٰذَا الْقَوْلَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قُلِ اللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي فَقَالَهَا ثُمَّ قَالَ عُدْ فَعَادَ ثُمَّ قَالَ عُدْ فَعَادَ فَقَالَ قُمْ فَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ

অর্থঃ হযরত জাবের রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া বলিতে লাগিল, "হায় আমার গোনাহ্" ! "হায় আমার গোনাহ্" !! দুই অথবা তিন বার এইরূপ

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ
থাকে, উহার পর সে নিজেকে বিরত রাখে এবং শুধু দেখিয়া ও স্পর্শ করিয়াই ক্ষান্ত হয়, তবে দেখা অথবা স্পর্শ করার কারণে যেই অন্ধকার তাহার অন্তরে সৃষ্টি হইবে, উহার তুলনায় নিজেকে যিনা হইতে বাঁচাইয়া রাখার কারণে নূর বেশী হইবে। কাফ্ফারা হওয়ার অর্থ ইহাই। কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি পুরুষত্বহীন হয়, অথবা কোন কারণে সহবাসে অক্ষম হয়, তবে তাহার বিরত থাকা কাফ্ফারা হইবে না।
—এহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন পৃঃ ১৩৮ (বাংলা সংস্করণ) —অনুবাদক।—

বলিলে পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি এইরূপ বল—

اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي

(অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমার গোনাহ্ হইতে তোমার মাগফেরাত অনেক বেশী প্রশস্ত। আর তোমার রহমতই আমার নিকট আমার আমল হইতে অনেক বড় আশার বস্তু)

ঐ ব্যক্তি এইরূপই বলিল, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি আবার এইরূপ বল, সে পুনরায় উহা বলিল। তিনি আবারো উহা বলিতে হুকুম করিলে সে এইবারও উপরোক্ত দোয়া পড়িল। এইবার পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, উঠ, আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। —মুসতাদরাকে হাকিম।

ব্যাখ্যাঃ এই হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, গোনাহের কারণে হযরত ছাহাবায়ে কেরামগণের অন্তরে কতটা ভয়-ভীতি ও পেরেশানী সৃষ্টি হইত। উপরোক্ত হাদীস ছাড়াও গোনাহের কারণে ছাহাবায়ে কেরামদের মনে ভীতি ও পেরেশানী সৃষ্টি হওয়ার আরো অনেক ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মোমেন ব্যক্তি গোনাহ্কে এমন মনে করে যেন তাহার মাথার উপর একটি পাহাড় রহিয়াছ এবং যে কোন সময় উহা তাহার মাথার উপর পতিত হইতে পারে। আর গোনাহ্গার ও ফাজের ব্যক্তি গোনাহ্কে এমন মনে করে যেন তাহার নাকের উপর একটি মাছি আসিল, আর সে হাত দ্বারা উহাকে তাড়াইয়া দিল।

অর্থাৎ ফাজের বা গোনাহ্গার ব্যক্তি গোনাহ্কে একেবারেই মামুলী বিষয় মনে করে। গোনাহ্র কারণে তাহার অন্তরে কোন প্রকার ভয়-ভীতি সৃষ্টি হয় ন। পক্ষান্তরে গোনাহের কারণে মোমেনের অন্তরে এমন পেরেশানী ও ভীতির সঞ্চার হয় যেন এক্ষুণি তাহার মাথায় পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িবে। ইহা প্রকৃত মোমেনের ছিফাত যাহা ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল।

হযরত জাবের রাজিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর বর্ণনায় অপর যেই বিষয়টি জানা গেল তাহা এই যে, মাগফেরাতের জন্য নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত দোয়াটির তালিম দিয়াছেন–

اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِىْ وَرَحْمَتُكَ اَرْجٰى عِنْدِىْ مِنْ عَمَلِىْ

(দোয়াটির অর্থ পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে)

গোনাহের কারণে লজ্জিত ও পেরেশান হইয়া আগত ছাহাবাকে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার উপরোক্ত দোয়াটি পড়াইলেন। অতঃপর এরশাদ করিলেন, উঠিয়া দাড়াও, আল্লাহ্ পাক তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। উক্ত ছাহাবা তো পূর্ব হইতেই লজ্জা ও অনুশোচনায় দগ্ধ হইতেছিলেন। অনুশোচনা হইল তওবার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। এক্ষণে এই অনুশোচনা ও পাপের অনুভূতি, স্বীয় অপরাধ স্বীকার, পাপের তুলনায় আল্লাহ্র রহমতের অসীমতার অনুভূতি এবং সব শেষে আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহ প্রাপ্তির বুকভরা আশা লইয়া ক্ষমা প্রার্থনা– ইত্যাদি বিষয়গুলির যখন এক সঙ্গে সমাবেশ ঘটিল, তখন তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইল। পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের জন্য কত সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর দোয়ার তালিম দিয়াছেন।

فَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ

পাপের অনুশোচনায় মুক্তি

হাদীস–১১

وَعَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ لَقِيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَا النَّجَاةُ فَقَالَ اَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلٰى خَطِيْئَتِكَ ـ

অর্থঃ হযরত উক্কবা বিন আমির রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, (একবার) নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আরজ করিলাম, মুক্তির উপায় কি? এরশাদ হইল, তোমার জবানকে সংযত রাখ এবং নিজের ঘরেই অবস্থান কর। আর নিজের গোনাহের জন্য রোনাজারী কর।

–আহমদ,তিরমিযি।

ব্যাখ্যাঃ হযরত উক্কবা বিন আমির রাজিয়াল্লাহু আনহু মুক্তি ও নাজাতের উপায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি মূল্যবান নসীহত এরশাদ করিলেন। যেই ব্যক্তি ঐ সকল নসীহতের উপর আমল করিবে সে যাবতীয় গোনাহ্ এবং দুনিয়া ও আখেরাতের মুসীবত হইতে মুক্তি পাইবে।

প্রথম নসীহতঃ

প্রথমে বলা হইয়াছে যে, তুমি তোমার জবানকে নিয়ন্ত্রণে রাখ। যদি জবানকে সংযত না রাখ তবে সে তোমাকে নানা প্রকার গোনাহ্ ও মুসীবতে লিপ্ত করিয়া তোমার বিশেষ ক্ষতিসাধন করিবে। জবান সামান্য বস্তু হইলেও উহার কারণে মানুষ ভয়াবহ মুসীবতের শিকার হইয়া থাকে।

এক হাদীসে আছে, নিঃসন্দেহে নিজের পায়ের দ্বারা মানুষের যতটুকু পদস্খলন ঘটে উহার চাইতে অধিক স্খলন ঘটে তাহার জবানের কারণে।

–মেশকাত।

হযরত ছুফিয়ান বিন আব্দুল্লাহ্ ছাক্বাফী রাজিয়াল্লাহু আনহু আরজ করিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ্! আমার ব্যাপারে আপনি সর্বাধিক কোন জিনিসের ভয় করিতেছেন? উত্তরে তিনি স্বীয় জবানকে স্পর্শ করিয়া এরশাদ করিলেন, এই জিনিসটিকেই আমি অধিক ভয় করিতেছি। –তিরমিযি।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

مَنْ صَمَتَ نَجَا

"যে নীরব রহিয়াছে, সে মুক্তি পাইয়াছে"।

আমাদের করণীয় হইল, অর্থহীন কথা–বার্তা, মিথ্যা কথা, গীবত (পরোক্ষে নিন্দা), তোহ্মত (মিথ্যা অপবাদ),–ইত্যাদি গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকিয়া তেলাওয়াত, জিকির, এস্তেগফার, দরূদ পাঠ–ইত্যাদি এবাদতে

মশগুল থাকা এবং সংক্ষেপে জরুরী কথা শেষ করিয়া পুনরায় আল্লাহ্ পাকের জিকিরে মনোনিবেশ করা। আমার লিখিত "জাবান কি হেফাজত" নামক কিতাবে এতদ্‌বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। (সম্প্রতি ঢাকার মোহাম্মদী লাইব্রেরী "জবানের হেফাজত" নামে উক্ত গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছে। -অনুবাদক)।

দ্বিতীয় নসীহতঃ

দ্বিতীয় নসীহতটি হইল, "তোমার ঘরেই তুমি অবস্থান কর"। ইহা একটি অমূল্য নসীহত্। দুনিয়ার পরিবেশ আজ এতই নোংরা হইয়া গিয়াছে যে, পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে তথা সর্বত্রই যেন পাপের বন্যা বহিতেছে। সুতরাং ঘর হইতে বাহির হইলে সহজেই মানুষ বিবিধ পাপকার্যে আক্রান্ত হইতেছে। বদ্‌নেগাহী বা কু-নজর এবং গান-বাজনা বর্তমানে একেবারেই সহজলভ্য গোনাহে পরিণত হইয়াছে। বিপথগামী লোকেরা সর্বত্র মানুষকে পাপের পথে আকর্ষণ করিতেছে। পথে বাহির হইলেই মানুষ অন্যায়-অপরাধ ও জুলুমের শিকার হইতেছে অথবা নিজেই অপরের উপর জুলুম করিয়া বসিতেছে। এক কথায়, পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে সর্বত্র আজ অন্যায়, অপরাধ, সন্ত্রাস, জান-মালের নিরাপত্তাহীনতা ও বিবিধ ফেৎনা-ফাসাদের জাল বিস্তার করিয়া আছে। সুতরাং দ্বীনী ও দুনিয়াবী জরুরতে ঘর হইতে বাহির হইলে যথা সম্ভব দ্রুত কাজ সমাধা করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসাই নিরাপদ। ঘরের বাহিরে যত বেশী সময় কাটানো হয় ততই বিভিন্ন প্রকার বালা-মুসীবত ও গোনাহ্-খাতায় লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

তৃতীয় নসীহতঃ

তৃতীয় নসীহতে বলা হইয়াছে, "তুমি নিজের গোনাহের জন্য রোনাজারী কর"। এই নসীহতটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বান্দার দ্বারা কোন গোনাহ্ হইয়া গেলে কান্নাকাটি করা-ইহাই নাদামাত ও পেরেশানীর লক্ষণ। আর নাদামাত বা স্বীয় অপরাধের কথা স্মরণ করিয়া মনে মনে লজ্জিত হওয়া এবং কলবের মধ্যে অনুশোচনা সৃষ্টি হওয়াই তওবার মূল কথা। বান্দার অন্তরে যখন আল্লাহ্‌র ভয় সৃষ্টি হইবে তখনই সে নিজের গোনাহের কারণে কান্নাকাটি ও রোনাজারী করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। আল্লাহ্‌কে ভয় করা এবং সেই ভয়ের কারণে

মওলার দরবারে রোনাজারী করা- ইহা আল্লাহ্ পাকের নিকট অনেক দামী বস্তু।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এমন দুইটি চক্ষু আছে যাহাদিগকে আগুন স্পর্শ করিবে না (অর্থাৎ দোজখ হইতে হেফাজতে থাকিবে)। প্রথমতঃ ঐ চক্ষু যাহা আল্লাহ্ পাকের ভয়ে কান্নাকাটি করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ঐ চক্ষু যাহা আল্লাহ্‌র পথে প্রহরায় থাকিয়া রাত্রি জাগরণ করিয়াছে। -তিরমিযি।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন মোমেন বান্দার চক্ষু হইতে যদি আল্লাহ্‌র ভয়ে অশ্রু বাহির হয়, যদিও ঐ অশ্রু মাছির মাথার বরাবরই হউক না কেন অতঃপর ঐ অশ্রু তাহার চেহারায় পৌঁছিয়া যায়, তবে আল্লাহ্ পাক তাহার উপর দোজখ হারাম করিয়া দিবেন।

-ইবনে মাজা, বায়হাকী।

একদা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের মধ্যে ক্রন্দন করিতেছিলেন। কান্নার কারণে তাঁহার সীনা মোবারক হইতে জাঁতা পেষণের শব্দ বাহির হইতেছিল। কোন কোন বর্ণনা মতে তাঁহার সীনা মোবারক হইতে হাড়িতে পানি ফুটিবার মত শব্দ হইতেছিল।

-আবুদাউদ, নাসাই, ইবেনহিব্বান।

আল্লাহ্‌র পেয়ারা রাসুল ছিলেন মাসুম ও নিস্পাপ। তবুও তাঁহার রোনাজারী ও কান্নাকাটির এই হাল ছিল। সুতরাং আমরা গোনাহগার বান্দাদের জন্য কি পরিমাণ কান্না-কাটি করা উচিৎ তাহা নিজেরাই ভাবিয়া দেখুন। যেই ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহ্ পাকের দরবারে কান্নাকাটি করিয়া নিজের গোনাহ্-খাতা ক্ষমা করাইয়া লইবে, আখেরাতে সে রাহাত ও আরামের জীবন লাভ করিবে। ভাই সকল! দোজখের আজাব বড় কঠিন, আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে দোজখের আজাব হইতে হেফাজত করুন।

এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, হে লোক সকল! ক্রন্দন কর, যদি কান্না না আসে তবে কান্নার ভান কর। কেননা দোজখবাসীগণ দোজখের মধ্যে এত কান্নাকাটি করিবে যে, তাহাদের চোখের পানি পড়িতে পড়িতে চেহারার মধ্যে

নহরের মত নালা হইয়া যাইবে। কাঁদিতে কাঁদিতে চোখের পানি শেষ হইয়া রক্ত প্রবাহিত হইতে থাকিবে এবং চোখের মধ্যে ক্ষত সৃষ্টি হইয়া যাইবে।

গোনাহ্ স্বীকার করাই তওবার সূচনা

হাদীস—১২

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ

হযরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, নিশ্চয়ই বান্দা যখন নিজের গোনাহ স্বীকার করিয়া তওবা করে তখন আল্লাহ্ পাক তাহার তওবা কবুল করিয়া লন। —বোখারী।

ব্যাখ্যাঃ নিজের অপরাধ ও গোনাহ্ স্বীকার করা ভাল লক্ষণ। কারণ নিজের অপরাধ স্বীকারের পরই তওবা করিবার তওফীক হয়। যাহারা গোনাহ্কে গোনাহ্ বলিয়া মনে করে না, অথবা গোনাহ্ করিয়া অপরাধ স্বীকার করে না। এই ধরনের লোকদের তওবা করিবার সুযোগই হয় না। শয়তান মালাউন আল্লাহ্ পাকের হুকুম অমান্য করিয়া হযরত আদম আলাইহিস্সালামকে সেজদা করে নাই। আল্লাহ্ পাক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

مَا مَنَعَكَ اَنْ لَا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ

অর্থঃ তুমি যে সেজদা করিলে না, কিসে তোমাকে ইহা হইতে বিরত রাখিল?

উত্তরে সে বলিল—

ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا

অর্থঃ আমি কি এমন ব্যক্তিকে সেজদা করিব যাহাকে আপনি মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছন?

মরদূদ শয়তান আল্লাহ্ পাকের হুকুমকেই অন্যায় বলিয়া সাব্যস্ত করিতে লাগিল। এমনিভাবে দুনিয়াতে যাহাদের উপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে তাহারা অন্যায়—অপরাধ ও গোনাহের কাজ করিয়াও এই কথা স্বীকার করে না যে, আমরা অন্যায় করিয়াছি। অনেকে আবার এমন ওজর—আপত্তিও পেশ করে, শরীয়তের দৃষ্টিতে যাহা গ্রহণযোগ্য নহে। আবার কোন কোন হতভাগা এমনও আছে যাহারা আল্লাহ্ পাকের হুকুমকেই অযৌক্তিক বলিয়া মন্তব্য করিয়া থাকে। আরেক ধরনের লোক আছে যাহারা গোনাহ ও নাজায়েজকে জায়েজ বানাইবার জন্য বিভিন্ন প্রকার বাহানা ও কারণ তালাশ করিয়া ফিরে। যাহাদের চরিত্র এইরূপ তাহারা কেমন করিয়া নিজের অপরাধ স্বীকার করিবে? আর মানুষ যদি নিজের অপরাধকে অপরাধই মনে না করে তবে কি করিয়া তাহার তওবা নসীব হইবে? ইহা শয়তানের বিরাট সাফল্য যে, সে মানুষের দ্বারা অপরাধ করায় কিন্তু তাহাকে অপরাধ স্বীকার করিতে দেয় না এবং বিভিন্ন ছল—চাতুরী ও হীলা—বাহানা করিয়া তাহাকে তওবা হইতে বিরত রাখে। কোন মানুষ যখন তওবা না করিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হয় তখন শয়তানের আনন্দের সীমা থাকে না।

এক ধরনের মানুষ আছে যাহারা সুদ গ্রহণ করে কিন্তু উহাকে 'ব্যবসা' হিসাবে আখ্যা দিয়া স্বীয় নফ্সকে ধোকা দিতেছে। টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করে অথচ মুখে বলে যে, আমরা অহংকার করি না। (অথচ তাহারাই টাখনুর উপরে কাপড় পরাকে অভদ্রতা মনে করে, ইহা অহংকার নহে তো কি?) দাড়ি চাঁছিয়া অপরাধ স্বীকার করিবে তো দূরের কথা পাল্টা বলিয়া বেড়ায় যে, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবের সাধারণ রেওয়াজ হিসাবেই দাড়ি রাখিয়াছিলেন। আজ যদি তিনি দুনিয়াতে জীবিত থাকিতেন, তবে তিনিও দাড়ি চাঁছিয়া ফেলিতেন (নাউযুবিল্লাহ্) শয়তানের ধোকায় পড়িয়া কত মারাত্মক অপব্যাখ্যা করা হইতেছে। আজকাল অনেকেই মদ্য পান করিয়া উহাকে ভিন্ন নামে আখ্যা দিয়া স্বীয় অপরাধ ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছে। ঘুষকে 'হাদিয়া' নাম দিয়া চালানো হইতেছে। এই সবই হইল নফ্স ও শয়তানের ধোকা। এই ধরনের ছল—চাতুরী দ্বারা আখেরাতের আজাব হইতে মুক্তি পাওয়া যাইবে না।

গোনাহ্ করিবার পর মানুষের মনে যদি অনুশোচনা সৃষ্টি হয়, নিজের অপরাধের অনুভূতিতে যদি সে লজ্জিত হয় তবে তাহার দ্বারা তওবা করা

সম্ভব। পক্ষান্তরে যাহারা অপরাধ ও গোনাহ্ করিবার পর পাল্টা তর্ক করে, গোনাহ্‌কে হালাল মনে করে এবং এই গোনাহ্ হইতে যাহারা বাঁধা দান করে তাহাদিগকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করিয়া বোকা বানাইতে চেষ্টা করে- তওবা করা কখনো তাহাদের ভাগ্যে জোটে না।

প্রকৃত মোমেনের শান হইল, প্রথমতঃ সে গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে চেষ্টা করিবে। আর যদি কখনো কোন প্রকার গোনাহ্ হইয়া যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে সে আল্লাহ্ পাকের দরবারে অপরাধ স্বীকার করিয়া তওবা ও এস্তেগফারে লাগিয়া যাইবে।

ছোট ছোট গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকার তাকীদ

হাদীস-১৩

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا عَائِشَةُ اِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ فَاِنَّ لَهَا مِنَ اللّٰهِ طَالِبًا

অর্থঃ হযরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে আয়েশা! যেই সকল গোনাহ্‌কে ছোট ও নগণ্য মনে করা হয় উহা হইতেও বাঁচিয়া থাক। কেননা, আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে উহার ব্যাপারেও তলবকারী অর্থাৎ লিপিবদ্ধকারী ফেরেস্তা মওজুদ রহিয়াছে। -ইবনে মাজা, দারেমী, বায়হাকী।

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদীসে ছগীরা গোনাহ্ হইতেও বাঁচিয়া থাকার তালীম দিয়া বলা হইয়াছে, উহাকে কখনো মামুলী কনে করিও না। কারণ, ছগীরা গোনাহের জন্যও জবাবদিহি ও শাস্তি হইতে পারে। আসল ব্যাপার হইল, কবীরা গোনাহের তুলনায় ছগীরা গোনাহ্‌কে "ছোট গোনাহ্" মনে করা হয়। কিন্তু আল্লাহ্ পাকের শান ও আজমত এবং বান্দার প্রতি তাঁহার অফুরন্ত নেয়ামত, রহমত ও অনুগ্রহের কথা চিন্তা করিলে ঐ ছগীরা গোনাহ্‌কেও "মহা পাপ" বলিয়াই মনে হইবে।

মানুষ যখন ছগীরা গোনাহ্‌কে মামুলী মনে করিতে থাকে, তখন প্রথমতঃ তাহার তওবা করার সুযোগ হয় না। দ্বিতীয়তঃ ঐ ছগীরা গোনাহ্ ক্রমে তাহাকে কবীরা গোনাহের দিকে টানিতে থাকে। আর তওবার অভ্যাস না থাকার কারণে তাহার কবীরা গোনাহ্ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এদিকে ছগীরা গোনাহ্‌সমূহ বার বার করিবার কারণে উহাও কবীরা গোনাহে পরিণত হয়। এইভাবে মানুষ যখন যাবতীয় গোনাহে অভ্যস্ত হইয়া যায় তখন সে আল্লাহ্ পাকের নাফরমানীতে ক্রমে একেবারেই বে-পরোয়া হইয়া উঠে এবং একদিন তওবা ছাড়াই মৃত্যু মুখে পতিত হয়। মোমেন বান্দাদের জন্য সর্বাবস্থায় যাবতীয় ছগীরা গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকা আবশ্যক। যখনই কোন গোনাহ্ হইবে, সঙ্গে সঙ্গে তওবা-এস্তেগফার করিয়া লইবে। ছগীরা গোনাহ্‌কে কখনো তুচ্ছ মনে করিবে না।

নফ্‌স ও শয়তান মানুষকে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ছোট হইতে বড় অপরাধের দিকে টানিতে থাকে। প্রথমে সে কোন মাকরূহ আমলের বিষয়ে অভয় দিয়া বলে যে, ইহা তো মাকরূহ, হারাম নহে। সুতরাং তেমন ভয়ের কোন কারণ নাই। অথচ মাক্‌রূহ হইতে বাঁচিয়া থাকাও আবশ্যক। কিন্তু চতুর শয়তান মানুষকে প্রথমে মাক্‌রূহে তানযীহ্, পরে মাক্‌রূহে তাহ্‌রিমী এবং সব শেষে হারাম কাজে অভ্যস্ত করাইয়া ছাড়ে।

মানুষ যখন গোনাহের কাজে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে তখন তাহার পক্ষে গোনাহ্ ত্যাগ করা কষ্টসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। এই ধরনের লোকেরা তওবার সুযোগ হইতেও মাহরূম থাকে। আগুন কম হউক আর বেশী হউক সকল অবস্থায়ই উহা মানুষের জন্য বিপদজনক। মানুষের সর্বনাশ করিতে বেশী আগুনের প্রয়োজন হয় না। আগুনের সমান্য একটি স্ফুলিঙ্গ যদি কোন ক্রমে মানুষকে স্পর্শ করিতে পারে, তবে উহাই ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া মানুষকে জ্বালাইয়া-পোড়াইয়া ভস্ম করিয়া দিতে পারে। বিষ বেশী হউক আর কম হউক, সর্বাবস্থায় উহা মানুষের জন্য ক্ষতিকর। এমনিভাবে ছোট-বড় সকল গোনাহ্‌ই মানুষের জন্য আজাবের কারণ হইবে। আল্লাহ্ পাক বড় মেহেরবান, তিনি ইচ্ছা করিলে মানুষকে ক্ষমা করিয়া দিতে পারেন, আবার ক্ষমা না করিয়া শাস্তিও দিতে পারেন। আমাকে যদি ক্ষমা না করিয়া আজাবে নিক্ষেপ করা হয়

তবে সেই ক্ষেত্রে আমার পরিণতি কি হইবে? এই সকল মোরাকাবা করিয়া নিজেকে যাবতীয় গোনাহ্ ও নাফরমানী হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে।

সমাজে এক ধরনের মানুষ আছে, তাহাদিগকে যদি বলা হয় যে, অমুক কাজটি করা শরীয়ত সম্মত নহে; তখন তাহারা পাল্টা প্রশ্ন করিয়া বসে যে, উহা কি নাজায়েজ না হারাম? অর্থাৎ তাহারা যেন এই কথাই বলিতে চায় যে, হারামের হাতুড়ী হইতে আত্মরক্ষার চিন্তা করা যাইতে পারে কিন্তু নাজায়েজের চাবুক হইতে বাঁচিবার প্রয়োজন নাই। অথচ হারামও নাজায়েজই বটে। শরীয়তে যাহার অনুমতি নাই উহাই নাজায়েজ। সুতরাং না জায়েজের মধ্যে মাকরূহ, হারাম সবই সমান। কাজেই দুনিয়ার সামান্য ভোগ-বিলাসের জন্য আখেরাতের কঠিন আজাব সহিতে নিজেকে প্রস্তুত করা ভয়াবহ বোকামি ছাড়া আর কিছুই নহে।

আসল ব্যাপার হইল আমাদের মন-মানসিকতায় আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতার স্বভাব গড়িয়া ওঠে নাই। অন্যথায় যেই মহান রাব্বুলআলামীন আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহার অসংখ্য নেয়ামত আমরা অহরহ ভোগ করিতেছি; তাহার নাফরমানী ছোট হউক বড় হউক, উহা সরাসরি অকৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নহে। আমাদের গোনাহের কারণে আল্লাহ্ পাক যদি আমাদিগকে কোন প্রকার শাস্তি নাও দেন এবং তিনি আমাদিগকে "ক্ষমা করিয়া দিবেন" এমন নিশ্চিত সংবাদ যদি পূর্ব হইতেই জানাইয়া দেওয়া হইত, তথাপি ছোট-বড় সকল প্রকার গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকা আমাদের জন্য আবশ্যক। আজাবের ভয়ে নাফরমানী হইতে বিরত থাকা হইল নিমক হারাম গোলামের চরিত্র। যেই গোলাম শাস্তির ভয়ে মনিবের আনুগত্য করে সে কখনো মনিবের প্রকৃত অনুগত হইতে পারে না। প্রকৃত ওফাদার ও অনুগত গোলাম কস্মিনকালেও মনিবের অবাধ্য হওয়ার কল্পনাও করিতে পারে না। বরং মনিবের অসংখ্য নেয়ামতে অবগাহন করিয়া আনুগত্যই যেন তাহার স্বভাবে পরিণত হইয়া যায়। হুকুম অমান্য করিলে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, অথবা অপরাধ স্বীকার করিলে মার্জনা পাওয়া যাইবে- ইত্যাদি ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ তাহার হয় না। সে শুধু ইহাই জানে যে, মনিব যাহা হুকুম করিবেন আমাকে তাহাই মানিতে হইবে। মনিবের সামান্য অবাধ্যতা ও নাফরমানীই তাহার নিকট আজাবের মত মনে হয়।

প্রকৃত গোলাম ও নেক বান্দাদের অবস্থা হইল, লাঠি দ্বারা আঘাত করিলে দৃশ্যতঃ দেহের উপর কষ্ট অনুভব হয়। কিন্তু সামান্য নাফরমানীর কারণে আল্লাহ্ পাকের ফরমাবরদারীতে যেই বিঘ্ন সৃষ্টি হইল, উহার অনুশোচনায় কলবের মধ্যে যেই পেরেশানী ও যন্ত্রণা সৃষ্টি হয় উহার জ্বলন ও দহন শারীরিক আজাব হইতেও অধিক কষ্টদায়ক বলিয়া অনুভূত হয়। এই কারণেই নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে দুনিয়াতেই জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ পাওয়ার পরও ঐ ভাগ্যবান ছাহাবাগণ ছোট-বড় সকল প্রকার গোনাহ্কে সর্বদা ভয় করিয়া চলিতেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহারা আল্লাহ্ পাকের নাফরমানীর ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন।

মানব হৃদয়ে সর্বদা আল্লাহ্র ভয় বিরাজ করিতে থাকা ইহা আল্লাহ্ পাকের এক বিরাট নেয়ামত। কলবের মধ্যে যদি সর্বদা আল্লাহ্র ভয় বিরাজ করিতে থাকে তবে সে নিজের নফ্সকে যাবতীয় পাপাচার হইতে বিরত রাখিতে পারিবে। হযরত ছাহাবায়ে কেরাম রাজিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইনগণ মামুলী গোনাহ্কেও অনেক বড় মনে করিতেন।

বোখারী শরীফে হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহুর এরশাদ বর্ণনা করা হইয়াছে, তিনি মানুষকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, তোমরা এমন অনেক আমল করিয়া থাক যাহা তোমাদের দৃষ্টিতে চুলের চাইতেও চিকন মনে হয়, কিন্তু আমরা উহাকে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানায় ধ্বংসাত্মক অপরাধের মধ্যে গণ্য করিতাম।

মোট কথা, যাহার অন্তরে আল্লাহ্ পাকের ভয় বসিয়া গিয়াছে সে ছোট-বড় সকল প্রকার গোনাহ্ হইতে নিজের নফ্সকে হেফাজত করিয়া সর্বদা নেক আমলের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে।

★

হাদীস-১৪

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتّٰى يَدَعَ بِدْعَتَهُ ۔

অর্থঃ হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক সকল বেদ্আতীর তওবা স্থগিত রাখিয়াছেন যতক্ষণ না তাহারা ঐ বেদ্আত ত্যাগ করিবে। –তাবরানী।

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, কোন বেদ্আতী যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার বেদ্আত ত্যাগ না করিবে ততক্ষণ আল্লাহ্ পাক তাহার তওবা কবুল করিবেন না। বস্তুতঃ বেদ্আত এমন এব ভয়াবহ বস্তু যে, উহা মুসলমানদের দ্বীন ও ঈমানকে বরবাদ করিয়া দেয়। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের সকল বিভাগ ও শাখা পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। কোন্‌টি নেক আমল আর কোন্‌টি বদ আমল উহা পরিপূর্ণভাবে জানাইয়া দিয়াছেন। অতঃপর দ্বীনে মোহাম্মদীর মধ্যে আর কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধণের প্রয়োজন নাই।

আলেমগণ বলিয়াছেন, যেই ব্যক্তি দ্বীনের মধ্যে কোন বেদ্আতের প্রচলন করিল সে যেন তাহার আমল দ্বারা ইহাই প্রমাণ করিতে চাহিতেছে যে, (নাউযুবিল্লাহ্) নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের পরিপূর্ণ বিধান পেশ করেন নাই। সুতরাং দ্বীনের ঐ অসম্পূর্ণ বিধানসমূহ আমি আমল করিয়া পূর্ণ করিয়া দিতেছি। ভাবিয়া দেখুন, ইহা কত বড় গোমরাহী। অথচ আজ বহু মুসলমানই এই গোমরাহীতে লিপ্ত। তাহাদিগকে ঐ ভ্রান্ত নীতি ত্যাগ করিয়া সুন্নত ও শরীয়তের উপর আমল করিতে আহবান করিলেও তাহারা উহাতে কর্ণপাত করিতেছে না। বেদ্আতীদের জন্য সবচাইতে বড় দুর্ভাগ্যের বিষয় হইল, তাহাদের জীবনে তওবা করিবার সুযোগ হয় না। কারণ, তাহারা তো ঐ বেদ্আতকেই সুন্নত ও শরীয়ত মনে করিয়া আমল করিতেছে, সুতরাং তওবা করিবার প্রশ্নই আসে না।

কোন কোন রেওয়ায়েত মতে ইবলিস বলে যে, আমি মানুষের দ্বারা পাপ করাইতে করাইতে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছি, আর তাহারা এস্তেগফার দ্বারা আমাকে ধ্বংস করিয়াছে। (অর্থাৎ আমি বহু পরিশ্রম করিয়া তাহাদের মধ্যে পাপের যেই অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছি মানুষ এক তওবা ও এস্তেগফার দ্বারা উহার মধ্যে পানি ঢালিয়া দিয়াছে)। যখন আমি এই দৃশ্য দেখিতে পাইলাম তখন আমি তাহাদিগকে নফ্‌সের খাহেশাতের মাধ্যমে বরবাদ করিলাম (অর্থাৎ

এমন সব আক্বীদা ও আমলের মধ্যে লাগাইয়া দিলাম যাহার সাথে কোরআন ও হাদীসের কোন সম্পর্ক নাই; কিন্তু মানুষ উহাকে দ্বীন মনে করিয়াই আমল করিতে লাগিল)। তাহারা যেহেতু বেদ্আতী আক্বীদা ও আমলকেই ছহী দ্বীন মনে করিয়া উহার উপর জমিয়া রহিয়াছে সুতরাং তাহারা কখনো তওবা করিতেছে না। –তারগীব ওয়া তারহীব।

এখানে আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হইল, বেদ্আতীগণ বিভ্রান্তির শিকার হইয়া স্বীয় বেদ্আত হইতে তওবা করিতেছে না। তাহারা যদি নিজেদের অপরাপর গোনাহের ব্যাপারে তওবা করে তবে উহাও কবুল হইবে না–যতক্ষণ না তাহারা নিজেদের বেদ্আত হইতে তওবা করিবে।[১]

ছুনানে ইবনে মাজাতে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ পাক কোন বেদ্আতীর রোজা, নামাজ, হজ্ব, ওমরা, জেহাদ এবং কোন ফরজ ও নফল আমল কবুল করিবেন না। আটা কাই বানানোর পর উহা হইতে চুল যেমন পরিষ্কারভাবে বাহির হইয়া আসে, তদ্রূপ বেদ্আতী ব্যক্তি ইসলাম হইতে পরিষ্কার বাহির হইয়া যাইবে।

–তারগীব ওয়া তারহীব, মুনজিরী।

কোন মুসলমান সম্পর্কে মাগফেরাত না হওয়ার মন্তব্য করা

হাদীস–১৫

وَعَنْ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَ اَنَّ رَجُلًا قَالَ وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلَانٍ وَاَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ : مَنْ ذَا الَّذِى يَتَاَلّٰى عَلَىَّ اَنِّىْ لَا اَغْفِرُ لِفُلَانٍ وَاَحْبَطْتُ عَمَلَكَ ـ اَوْكَمَا قَالَ ـ

অর্থঃ হযরত জুনদুব রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসুলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এক ব্যক্তি কোন

১। বেদ্আতের নূতন নূতন নিয়ম–পদ্ধতি আবিষ্কারকারী এবং উহার প্রতি মানুষকে আহবানকারীদের চরম পরিণতির দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখুন, উহার দ্বারা শুধু যে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে এমন নহে, বরং যত মুসলমান ঐ ভ্রান্ত নীতির উপর আমল করিবে উহার সমুদয় গোনাহ্ তাহার আমল নামায়ও লেখা হইবে। –আহকামে মাইয়্যেত।

গোনাহ্গার সম্পর্কে মন্তব্য করিল যে, আল্লাহ্র কসম! অমুককে আল্লাহ্ ক্ষমা করিবেন না। অথচ আল্লাহ্ পাক এরশাদ করিয়াছেন যে, এই ব্যক্তি কে? যে শপথ করিবার অধিকার না পাইয়াও শপথ করিয়া আমার উপর বাধ্যতা আরোপ করিতেছে যে, আমি অমুককে ক্ষমা করিব না। হে ঐ ব্যক্তি! যে এমন শপথ করিয়াছে, আমি তোমার আমলকে বরবাদ করিয়া দিলাম আর ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করিয়া দিলাম। –ছহী মুসলিম।

ব্যাখ্যাঃ উক্ত হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহ্ এবং তাহার বান্দার মধ্যকার কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা ঠিক নহে। মানুষ যত বড় পাপীই হউক, সে যখন খালেছ নিয়তে এবং যথাযথভাবে তওবা করিবে তখন আল্লাহ্ পাক নিশ্চয়ই তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। অনেকেই এমন মন্তব্য করিয়া বসে যে,অমুক ব্যক্তি কিভাবে ক্ষমা পাইবে? তাহার নিকট তো ক্ষমা পাওয়ার মত কোন ছামান দেখা যাইতেছে না। এই ধরনের মন্তব্য একেবারেই অর্থহীন। আগে নিজের ব্যাপারে চিন্তা করা প্রয়োজন। নিজের চিন্তায় যে মশগুল থাকিবে সে অপরের ব্যাপারে মন্তব্য করার সুযোগই পাইবে না। নিজের দ্বীনদারী ও পরহেজগারীর উপর অহংকার করা, নিজের মাগফেরাতের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া আর অপরের গোনাহ্–খাতার হিসাব–নিকাশ করিয়া মন্তব্য করা যে, অমুকের মাগফেরাত হইবে না– ইত্যাদি বড় বোকামি ও দুর্ভাগ্যজনক। ইহা মোমেনের শানের খেলাফ। প্রকৃত অবস্থা হইল,কোন মুসলমানই নিজের হাল ও পরিণতি কি হইবে এই বিষয়ে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার সহিত কিছুই বলিতে পারে না। সুতরাং অপরের মাগফেরাতের ব্যাপারে মন্তব্য করার তো কোন প্রশ্নই আসে না। মাগফেরাতের মালিক আল্লাহ্। তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই ক্ষমা করিবেন। এই ব্যাপারে দখল দেওয়ার কাহারো কোন অধিকার নাই। এই অনধিকার চর্চার কারণেই আল্লাহ্ পাক ঐ ব্যক্তির আমল নষ্ট করিয়া দিয়াছেন যেই ব্যক্তি শপথ করিয়া বলিয়াছে যে, আল্লাহ্ পাক অমুককে ক্ষমা করিবেন না। বরং যাহার ব্যাপারে মন্তব্য করা হইয়াছিল আল্লাহ্ পাক তাহাকেই ক্ষমা করিয়া দিলেন। অতএব, কোন গোনাহ্গারের ব্যাপারেই এই ধরনের মন্তব্য করা সমীচীন নহে। কাহার পরিণতি কি হইবে তাহা একমাত্র আল্লাহ্ পাকই ভাল জানেন।

হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম

ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী ইস্রাইলের দুই ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ দুই ব্যক্তির মধ্যে পরস্পর গভীর ভালবাসা ছিল। তাহাদের মধ্যে একজন ছিল বড় আবেদ আর অপরজন ছিল গোনাহ্গার। আবেদ ব্যক্তিটি তাহার গোনাহ্গার বন্ধুকে সর্বদা বলিত, তুমি আল্লাহ্র নাফরমানী হইতে বিরত থাক। সে জবাব দিত, আমার বিষয়ে ভাবিও না। আমার অবস্থা আমি জানি আর জানেন আমার আল্লাহ। মাঝে–মধ্যেই তাহাদের মধ্যে এই ধরনের কথা হইত। একদিন আবেদ ব্যক্তিটি তাহার গোনাহ্গার বন্ধুকে এমন এক অপরাধ করিতে দেখিল যে, সে মনে করিল, ইহা বড় মারাত্মক গোনাহ্। সুতরাং সে আগের মতই তাহাকে বলিল, তুমি পাপ হইতে বিরত থাক। সেও আগের মতই জবাব দিল, আমাকে আমার অবস্থায় ছাড়িয়া দাও, আমার অবস্থা আমি জানি আর আমার আল্লাহ্ জানেন। আমার উপর কি তোমাকে নেগরান বানাইয়া পাঠানো হইয়াছে? এই কথা শুনিবামাত্র আবেদ রাগান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিল, আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্ কখনো তোমাকে ক্ষমা করিবেন না এবং তোমাকে বেহেস্তে প্রবেশ করিতে দিবেন না। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ পাক ফেরেস্তা পাঠাইয়া উভয়ের জান কবজ করাইলেন। তাহাদিগকে আল্লাহ্র দরবারে হাজির করা হইলে তিনি আবেদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার বান্দার প্রতি যদি আমি রহম নাজিল করি তবে উহাতে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা তোমার আছে কি? উত্তরে সে তাহার অক্ষমতা প্রকাশ করিল, এইবার আল্লাহ্ পাক গোনাহ্গার ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিয়া আবেদকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিলেন। –মেশকাত।

উপরের ঘটনায় দেখা গেল, এক গোনাহ্গার ব্যক্তি নিজের অপরাধ স্বীকার করা এবং আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে মাগফেরাতের আশা পোষণ করার কারণে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইল। পক্ষান্তরে এক আবেদ ব্যক্তিকে তাহার বে–পরোয়া আচরণের কারণে দোজখে নিক্ষেপ করা হইল।

ছহী বোখারী ও মুসলিম শরীফে অপর এব ব্যক্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। বনী ইস্রাইলের এক ব্যক্তি ৯৯ জন মানুষকে হত্যা করিয়াছিল। অতঃপর সে তওবা করার উদ্দেশ্যে কোন আল্লাহ্ওয়ালার সন্ধানে বাহির হইল। এক রাহেব (সংসার বিরাগী আল্লাহগত প্রাণ ব্যক্তি)–এর সাক্ষাত পাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার তওবা কবুল হইবে কি? রাহেব জবাব দিল, তোমার তওবা কবুল হইবার নহে। এই কথা শুনিবামাত্র সে ঐ রাহেবকেও হত্যা করিয়া

ফেলিল (এইবার তাহার হাতে মানব হত্যার সংখ্যা একশত পূর্ণ হইল)। কিন্তু উহার পরও সে তওবার উদ্দেশ্যে কোন আল্লাহ্ওয়ালার সন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিল। কেহ তাহাকে বলিয়া দিল, তুমি অমুক বস্তিতে যাও। সে ঐ বস্তির দিকে যাত্রা করিলে পথে তাহার মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইল। মুমূর্ষু অবস্থায় কোন ক্রমে সে তাহার সীনাকে ঐ বস্তির দিকে ঘুরাইয়া দিল। অর্থাৎ তওবার উদ্দেশ্যে যেই বস্তির দিকে সে যাইতেছিল, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া যতটুকু সম্ভব নিজেকে সেই দিকে আগাইয়া দিল।

মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রহমত ও আজাবের ফেরেস্তাদের মধ্যে তাহাকে লইয়া বিবাদ শুরু হইল। রহমতের ফেরেস্তা বলিতে লাগিল, সে তওবার ফিকির করিতে করিতে মৃত্যুবরণ করিয়াছে, সুতরাং তাহার সহিত রহমতের আচরণ হওয়া উচিৎ। আজাবের ফেরেস্তা যুক্তি দেখাইয়া বলিল, সে তওবা করিতে পারে নাই; অতএব, তাহার সহিত আজাবের মোয়ামালা হওয়া উচিৎ। এই সময় আল্লাহ্ পাক (মৃত ব্যক্তি তওবার উদ্দেশ্যে যেই বস্তির দিকে যাইতেছিল সেই) বস্তিকে হুকুম করিলেন, তুমি ঐ মৃত ব্যক্তির নিকটবর্তী হইয়া যাও। আর যেই বস্তি হইতে সে যাত্র করিয়াছে উহাকে হুকুম করিলেন, তুমি মৃত ব্যক্তি হইতে দূরে সরিয়া যাও। অতঃপর আল্লাহ্ পাক ফেরেস্তাগণকে হুকুম করিলেন, উভয় বস্তির দূরত্ব পরিমাপ করিয়া দেখ, মৃত ব্যক্তি কোন্ বস্তির নিকটবর্তী। ফেরেস্তাগণ মাপিয়া দেখিল, যেই বস্তির দিকে সে তওবার উদ্দেশ্যে আগাইতেছিল সেই বস্তি তাহার দিকে মাত্র এক বিঘত পরিমাণ নিকটবর্তী। আর যেই বস্তি হইতে সে রওয়ানা হইয়াছে উহা সেই বস্তির তুলনায় এক বিঘত পরিমাণ দূরে। সুতরাং তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইল।

–মেশকাত।

আল্লাহু আকবার! একশত মানুষের হত্যাকারী যে এখনো তওবাও করে নাই; শুধু তওবার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছিল মাত্র। আল্লাহ্ পাক তাহার তওবার এরাদাকেই এমন কদর করিলেন যে, এক বস্তিকে নিকটে আসিতে এবং আরেক বস্তিকে দূরে সরিয়া যাইতে নির্দেশ দিলেন। ফলে উভয়ের দূরত্বের মধ্যে এক বিঘত ব্যবধান সৃষ্টি হইল, আর উহাকেই উছিলা করিয়া তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইল। সুতরাং মানুষ যতবড় গোনাহ্গারই হউক তাহার কর্তব্য

হইল আল্লাহ্ পাকের দিকে রুজু হওয়া, মনোযোগী হওয়া এবং যথা সম্ভব তওবার শর্তসমূহ আদায়ের মাধ্যমে তওবা করিতে থাকা। এইভাবে অগ্রসর হইতে থাকিলে ইনশাআল্লাহ্ আল্লাহ্ পাক জরুর ক্ষমা করিয়া দিবেন।

গোনাহ্ প্রকাশ করাও গোনাহ্

হাদীস—১৬

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ اُمَّتِىْ مُعَافًى اِلَّا الْمُجَاهِرُوْنَ وَاِنَّ مِنَ الْمُجَانَةِ اَنْ يَّعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ فَيَقُوْلُ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার সকল উম্মতই নিরাপদ (অর্থাৎ মাগফেরাতযোগ্য)। ঐ সকল লোক ব্যতীত যাহারা প্রকাশ্যে গোনাহ্ করে। ইহাও মানুষের অসাবধানতা ও বেপরোয়া আচরণ (যাহা শরীয়তে নিষিদ্ধ ও অপছন্দনীয়) যে, মানুষ অন্ধকার রাত্রিতে কোন পাপ কার্য করে আর আল্লাহ্ পাক উহাকে গোপন রাখা সত্ত্বেও সকালে সে মানুষকে ডাকিয়া বলে, আমি রাতে এমন এমন কাজ করিয়াছি। অথচ সে এমন অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছে যে, আল্লাহ্ পাক তাহাকে আবরণের মধ্যে রাখিয়াছেন, আর সকাল হইতেই সে আল্লাহ্র দেওয়া সেই আবরণ নিজের উপর হইতে সরাইয়া ফেলিল। –বোখারী, মুসলিম।

ব্যাখ্যাঃ আলোচিত হাদীসে গোনাহ্কে গোপন রাখার কথা বলা হইয়াছে। মোমেনের প্রথম কর্তব্য হইল, ছোট–বড় সকল গোনাহ্ হইতে পরহেজ করিয়া চলা। আর কখনো কোন গোনাহ্ হইয়া গেলে উহা প্রকাশ না করিয়া গোপনে আল্লাহ্ পাকের নিকট লজ্জিত হইয়া তওবা–এস্তেগফার করা। অপর কেহ যেন ঐ অপরাধ সম্পর্কে জানিতেও না পারে। মনিব ও গোলামের মধ্যেই

যেন সকল কিছু সমাধা হইয়া যায়।

এক ধরনের লোক আছে যাহারা গোপনে গোনাহ্ করিয়া পরে উহা ইয়ার-বন্ধুদের নিকট বলিয়া বেড়ায়। আর গোনাহ্ প্রকাশ করাকে ফখর ও গৌরবের বিষয় মনে করে। এই ধরনের বে-পরোয়া ও গর্হিত আচরণ আল্লাহ্‌র হুকুমের বিরোধিতা ও বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছুই নহে। গোনাহ্ প্রকাশ করাও অপরাধ। সুতরাং যাহারা গোনাহ্ করিয়া আবার উহা প্রচার করে তাহারা গোনাহের উপর গোনাহ্ করিল। শরীয়তের পরিভাষায় তাহাদিগকে 'মুজাহির' ও 'ফাসেকে মু'লিন' বলা হয়। ইহা ব্যতীত যাহারা স্বাভাবিক লজ্জা শরমের মাথা খাইয়া প্রকাশ্য দিবালোকে মানুষের সম্মুখে বে-পরোয়াভাবে আল্লাহ্‌র নাফরমানী করিতে থাকে তাহাদিগকেও 'ফাসেকে মু'লিন বলা হয়। এই ধরনের নাফরমানী ও নির্লজ্জতার কারণে মানুষের দিলের এতমিনান ও আত্মার শান্তি তিরোহিত হইয়া এক সার্বক্ষণিক মুসীবত ও পেরেশানীর সৃষ্টি হয়। ফলে আল্লাহ্‌র দিকে রুজু হওয়া ও তওবা করার সুযোগ হয় না। আর বিনা তওবায় ইন্তেকাল করা বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা।

তাহাজ্জুদের সময় তওবা করা

হাদীস-১৭

وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالٰى كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقٰى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ يَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِيْ فَاَسْتَجِيْبَ لَهٗ مَنْ يَسْاَلُنِيْ فَاُعْطِيَهٗ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَاَغْفِرَ لَهٗ

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যহ রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহ্ পাক (পৃথিবীর) নিকটবর্তী আসমানে নাজিল হইয়া ঘোষণা দেন; এমন কে আছ, যে আমার নিকট দোয়া করিবে আর আমি তাহার দোয়া

কবুল করিব? কোন কিছু প্রার্থনা করিবে আর আমি তাহাকে দান করিব? এমন কে আছ, যে আমার নিকট ক্ষমা চাহিবে আর আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিব?
-বোখারী,মুসলিম।

অন্য রেওয়ায়েতে আছে, আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন, "এমন কে আছ, যে এমন সত্তাকে করজ দিবে যাহার নিকট সকল কিছুই আছে, আর তিনি কাহারো উপর জুলুম করেন না।" ফজরের পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ্ পাক এইরূপ ঘোষণা দিতে থাকেন।

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদীসে পাকে শেষ রাতে দোয়া করা এবং স্বীয় গোনাহ্-খাতার জন্য আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমা চাওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সহিত বলা হইয়াছে। দোয়া কবুল হওয়ার সবচাইতে উত্তম সময় হইল, ফরজ নামাজের পর এবং শেষ রাতের মাঝামাঝি সময়। -তিরমিযি।

শেষ রাতে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন; কে আছে, যে আমার নিকট দোয়া করিবে আর আমি তাহার দোয়া কবুল করিব? আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, আর আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিব? এমন কে আছ, যে আমার নিকট কোন কিছু চাহিবে, আর আমি তাহাকে দান করিব? আল্লাহ্ পাকের এই ঘোষণা সকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। যাহারা তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত তাহারা তো প্রতি দিনই ঐ সময় আল্লাহ্ পাকের নিকট দোয়া করার এবং তওবা-এস্তেগফার ও নিজের হাজত পেশ করার সুযোগ পাইয়া থাকেন। যাহারা তাহাজ্জুদের সময় জাগ্রত হন না তাহারা অন্ততঃ মাঝে-মধ্যে ঐ সময় উঠিয়া আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া-খায়ের ও কান্নাকাটি করা উচিৎ। দোয়া এবং তওবা সকল সময়ই কবুল হইয়া থাকে। কিন্তু যখন স্বয়ং আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে ঘোষণা দেওয়া হয় যে, এমন কে আছ যে আমার নিকট কিছু চাহিবে আর আমি তাহাকে দান করিব? আমার নিকট ক্ষমা চাহিবে আর আমি ক্ষমা করিয়া দিব? ঠিক ঐ সময় দোয়া ও তওবা কবুলের খাছ সময়। তাহাজ্জুদের অভ্যাস না থাকিলেও যদি কোন দিন ঐ সময় হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় তবে ঐ সুযোগেই কিছু দোয়া-কালাম ও তওবা-এস্তেগফার করিয়া লওয়া উচিৎ, যেন আল্লাহ্ পাকের দেওয়া এই বিশেষ সুযোগ হইতে একেবারেই বঞ্চিত হইতে না হয়।

আল্লাহু আকবার। আল্লাহ্ পাক আমাদিগকে ক্ষমা করার জন্য ডাকিতেছেন আর আমরা আরামের সহিত ঘুমাইয়া রহিয়াছি; ইহা কত বড় দুর্ভাগ্যের কথা। আল্লাহ্ পাক আমাদিগকে ছহী সমঝ দান করুন। আমরা যেন একমাত্র তাহার নিকটই সকল কিছু কামনা করি। আমাদের জাহের–বাতেন ও মন–প্রাণ দিয়া যেন তাহার দিকেই ধাবিত হইতে পারি।

হাদীসের শেষাংশে বলা হইয়াছে- "কে আছ, যে এমন পাক জাতকে করজ দিবে যাহার নিকট সকল কিছুই আছে এবং তিনি কখনো জুলুম করেন না।" ইহার অর্থ এই যে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ছদকা, জাকাত–খয়রাত যাহা কিছুই দান করিবে উহার প্রতিদানে আল্লাহ্ পাক দুনিয়া ও আখেরাতে অনেক বেশী বিনিময় দান করিবেন। খরচ করা হইবে মাখলুকের উপর আর বিনিময় দিবেন সৃষ্টিকর্তা খালেক। তাঁহার কোন জিনিসেরই প্রয়োজন নাই। দুনিয়াতে যত মানুষের নিকট যত বস্তু আছে ঐ সমুদয় বস্তু আল্লাহ্ পাকই সৃষ্টি করিয়াছেন। দুনিয়াতে মাখলুক সৃষ্টির পর হইতে সকলের যাবতীয় ছামান তিনিই যোগান দিতেছেন। কিন্তু তাঁহার অফুরন্ত খাজানায় কখনো বিন্দুমাত্র কমী আসে নাই, আসিবেও না। ইহা তাঁহার খাছ মেহেরবানী যে, আল্লাহ্র দেওয়া জান–মাল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে খরচ করাকেই তিনি বান্দার পক্ষ হইতে 'করজ' বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। উপরন্তু উহার বদলা হিসাবে অনেক বড় বিনিময় দেওয়ার ওয়াদা করিয়াছেন। আর আল্লাহ্ পাক যাহা ওয়াদা করিয়াছেন উহা অবশ্যই পূরণ করিবেন।

এক্ষণে ভাবিয়া দেখুন, দুনিয়ার সকল ধন–সম্পদের মালিক আল্লাহ্, দুনিয়ার যেই মানুষ উহার 'অস্থায়ী মালিক' সেও আল্লাহ্ পাকেরই সৃষ্ট মাখলুক। অতঃপর উহা হইতে ছদকা দেওয়ার নাম রাখা হইয়াছে 'করজ' (ঐ ছদকাও আবার মানুষই ভোগ করিতেছে)। আবার ঐ করজের বিনিময়ে ছাওয়াবের ওয়াদা করা হইয়াছে। অর্থাৎ বান্দার প্রতি তাঁহার দয়া ও রহমতকে সহজলভ্য করার জন্যই তিনি এতসব আয়োজন করিয়াছেন।

তওবার হাকীকত এবং উহার তরীকা

হাদীস—১৮

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَاَبِىْ عَلٰى ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ فَقَالَ لَهٗ اَبِىْ سَمِعْتَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ النَّدَمُ تَوْبَةٌ ؟ قَالَ نَعَمْ -

অর্থঃ প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মা'কিল (রঃ) বলেন, আমি আমার পিতার সঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাছউদ রাজিয়াল্লাহু আনহুর খেদমতে হাজির হইলাম। আমার পিতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা বলিতে শুনিয়াছেন যে, লজ্জিত হওয়াই তওবা? উত্তরে তিনি বলিলেন, হাঁ! আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে ইহা শুনিয়াছি। [১] –মুসতাদরাকে হাকিম।

১। ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলেন, তিনটি ধারাবাহিক বিষয়ের সমন্বয়ে তওবা অস্তিত্ব লাভ করে। জ্ঞান, অনুশোচনা এবং বর্তমানে ও ভবিষ্যতে গোনাহ্ বর্জন করা। সাথে সাথে অতীত দিন সমূহের ক্ষতিপূরণ আদায় করাও কর্তব্য। এই বিষয়ত্রয়ের সমষ্টিকে পরিভাষায় তওবা বলা হয়। প্রায়শঃ কেবল অনুশোচনাকেই তওবা বলা হয় এবং জ্ঞানকে উহার ভূমিকা এবং গোনাহ্ বর্জনকে উহার ফলাফল আখ্যা দেওয়া হয়। এই দিক দিয়াই নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, اَلنَّدَامَةُ تَوْبَةٌ 'অনুশোচনা হইতেছে তওবা।' কেননা অনুশোচনার নিশ্চয় কোন কারণ থাকিবে এবং পরবর্তীতে উহার ফলাফলও কিছু প্রকাশ পাইবে। জনৈক বুজুর্গ তওবার সংজ্ঞায় বলেন, তওবা হইতেছে সাবেক গোনাহের জন্য অনুশোচনার অনলে অন্তর বিগলিত হওয়া। এই সংজ্ঞায় কেবল মর্মবেদনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কেহ কেহ এই মর্মবেদনার পরিষ্কার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, তওবা একটি অগ্নি, যাহা অন্তরে প্রজ্বলিত হয় এবং একটি বেদনা, যাহা হৃদয় হইতে আলাদা হয় না। কেহ কেহ গোনাহ বর্জনের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, তওবা হইল অনাচারের পোশাক খুলিয়া সরলতা ও হৃদ্যতার শয্যা পাতা। সহল ইবনে আব্দুল্লাহ্ তশতরী (রহঃ) বলেন, নিন্দনীয় কর্মকাণ্ডকে প্রশংসনীয় কর্মকাণ্ডে রূপান্তরের নাম তওবা। ইহা নির্জনবাস, মৌনতা ও হালাল ভক্ষণ ছাড়া সহজলভ্য নহে। সম্ভবতঃ এই সংজ্ঞায় তৃতীয় বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। তওবার প্রথম বিষয় জ্ঞানের উদ্দেশ্য হইল এই কথা জানা যে, গোনাহের ক্ষতি অসামান্য এবং অনেক গোনাহ মানুষ ও তাহার প্রেমাস্পদ আল্লাহ্র মধ্যে আড়াল হইয়া দাঁড়ায়। বলা বাহুল্য, এই জ্ঞানের ফল স্বরূপ অন্তরে অনুশোচনার উৎপত্তি হয়।

–এহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন, (বাংলা সংস্করণ) পৃঃ ১২ –অনুবাদক

ব্যাখ্যাঃ মানুষের দ্বারা কোন প্রকার গোনাহ্ বা অপরাধ সংঘঠিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু গোনাহ্ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা ও অনুশোচনায় দগ্ধ হইয়া মওলার দরবারে নিজের অপরাধের জন্য পেরেশানী জাহের করা– ইহা আল্লাহ্ পাকের নিকট বড় পছন্দনীয়। আর ইহাই তওবার মূল কথা ও প্রধান অঙ্গ। নিজের হীন অস্তিত্বের কথা স্মরণ করিয়া এই কথা চিন্তা করা যে, আল্লাহ্ পাক আমার সৃষ্টিকর্তা ও মালিক। তিনিই আমার অস্তিত্ব দান করিয়া উহার মধ্যে অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ দিয়াছেন। অতঃপর জীবন ধারণের অসংখ্য নেয়ামত দান করিয়াছেন। জীবন ও জীবিকা তাঁহারই দেওয়া সম্পদ। অথচ আমি আল্লাহ্ পাকের সেই নেয়ামত সমুহের দ্বারা তাঁহার বন্দেগী ও গোলামীর পরিবর্তে তাঁহার নাফরমানী করিতেছি। ইহার চাইতে বড় অপরাধ ও নাশুকরী আর কিছুই হইতে পারে না। এইভাবে বার বার আল্লাহ্ পাকের আজমত ও বড়ত্বের মোরাকাবা করিয়া নিজের দীনতা–হীনতার কথা স্মরণ করা যে, আমি কি ছিলাম, কোন বস্তু দ্বারা আমাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। অতঃপর পর্যায়ক্রমে আমাকে কত নেয়ামত দান করা হইয়াছ। কিন্তু হাঁয়! আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত ভোগ করিবার পরও আমি অধম কেমন করিয়া তাঁহার নাফরমানীতে লিপ্ত হইয়া গেলাম?

লজ্জা ও অনুশোচনাকে এই জন্য তওবার প্রধান অঙ্গ বলা হইয়াছে যে, গোনাহ্গার ব্যক্তি যখন সত্যিকার অর্থে অনুতপ্ত হইবে তখন উহার আছর ও প্রভাব তাহার আমলের মধ্যেও প্রকাশ পাইতে থাকিবে। এবং তওবার বাকী দুইটি অংশের উপরও আমল করা সহজ ইহয়া যাইবে। অতীতের অপরাধ ও গোনাহের কথা স্মরণ করিয়া অনুশোচনা ও অনুতাপের সাথে সাথে ভবিষ্যতের জন্যও পাকা এরাদা করিবে; যেন আর কখনো এই ধরনের অপরাধ ও গোনাহ্ না হয়। এই যাবৎ হক্কুল্লাহ্ ও হক্কুল এবাদ যাহা কিছু নষ্ট হইয়াছে উহার তালাফী ও ক্ষতিপূরণ করিতে থাকিবে। হক্কুল্লাহ্ ও হক্কুল এবাদের পরিমাণ যদি অধিক হয় তবে যত দিন উহা আদায় না হইবে তত দিন অবিরাম উহা আদায় করিতে থাকিবে। ইহাই সত্যিকার তওবা। শুধু মুখে তওবা! তওবা!! করিতে থাকিলেই তওবা হয় না।[১]

১। ছুনানে ইবনে মাজার টীকায় বলা হইয়াছে, অনুতাপ হইল তওবার বড় অংশ। অনুতাপই তওবার অন্যান্য অংশগুলিকে বাস্তবায়িত করে। কেননা, অনুতপ্ত ব্যক্তি তাৎক্ষণিকভাবে সমস্ত

হাদীস–১৯

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرٍ وَّصَدَقَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ يُّذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّىْ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِلَّا غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ ثُمَّ قَرَأَ وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ -

অর্থঃ হযরত আলী রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হযরত আবু বকর ছিদ্দীক রাজিয়াল্লাহু আনহু আমাকে যথার্থ বলিয়াছেন যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেহ গোনাহ্ করিবার পর যদি ভালভাবে পাকী হাসিল করে (অর্থাৎ যথাযথভাবে অজু করে এবং গোসল ফরজ হইয়া থাকিলে ভালভাবে গোসল করে) অতঃপর নামাজ পড়িয়া আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে আল্লাহ্ পাক তাহাকে অবশ্যই ক্ষমা করিয়া দিবেন। অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি তেলাওয়াত করিলেন–

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً .... وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ -

ব্যাখ্যাঃ পূর্ববর্তী হাদীসে তওবার প্রধান তিনটি অংশের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ–

১। অতীতের অপরাধ সমূহের উপর আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া।

২। ভবিষ্যতে গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকার অঙ্গীকার এবং–

৩। আল্লাহ্র হক ও বান্দার হক যাহা নষ্ট করা হইয়াছে তাহা আদায় করা।

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ

গোনাহ্ হইতে পবিত্র হইয়া যায় এবং ভবিষ্যতে গোনাহের পুনরাবৃত্তি না হওয়ার উপর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। মূলতঃ এই দুই কাজের দ্বারাই তওবা পূর্ণতা লাভ করে। তবে ফরজ কাজের ক্ষেত্রে উহা আদায় করা এবং হক্কুল এবাদের বেলায় বান্দার হক বান্দার নিকট পৌঁছানো প্রয়োজন। আর এই কথা সুস্পষ্ট যে, অনুতাপ এই কাজগুলিকে তরান্বিত করে।

এইভাবে যখন তওবা করা হইবে তখন উহা অবশ্যই কবুল হইবে। তওবার উপরোক্ত বিধানের সহিত যদি আরো কিছু আমল যোগ করা হয় তবে তওবা কবুলের বিষয়ে আরো বেশী আশাবাদী হওয়া যায়। যেমন– বেশী বেশী নেক আমল করা অথবা বিশেষ গুরুত্বের সহিত বড় ধরনের কোন নেক আমলে যত্নবান হওয়া–ইত্যাদি।

হাদীস শরীফে আছে, এক ব্যক্তি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল, ইয়া রাসুলাল্লাহ্! আমি অনেক অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছি, আমার তওবা কবুল হইবে কি? পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার মাতা জীবিত আছেন কি? সে জানাইল, তাহার মাতা জীবিত নাই। পুনরায় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কোন খালা জীবিত আছেন? সে আরজ করিল, তাহার খালা জীবিত আছেন। রাসুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইবার এরশাদ করিলেন, তোমার খালার সঙ্গে ভাল ব্যবহার কর। –তিরমিযি।

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, যেই ব্যক্তি মাতা ও খালার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিবে তাহার ঐ "ভাল ব্যবহার" তওবা কবুলের ব্যাপারে সহায়ক হইবে।

নামাজ পড়িয়া তওবা করার তালীম দেওয়া হইয়াছে, উহাও এই কারণে যে, নামাজ আল্লাহ্ পাকের অনেক বড় এবাদত। কয়েক রাকাত নামাজ পড়িয়া তওবা করিলে তওবা কবুলের ব্যাপারে অধিক আশাবাদী হওয়া যায়।

আলোচিত হাদীসে কালামে পাকের একটি আয়াতের যেই অংশবিশেষ উল্লেখ করা হইয়াছে উহা আল এমরানের আয়াত। পূর্ণ আয়াতটি নিম্নরূপ–

وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থঃ আর তাহারা এমন লোক যে, যখন এমন কোন কাজ করিয়া বসে যাহাতে অন্যায় হয়, অথবা নিজের ক্ষতি করিয়া বসে, তখন আল্লাহ্কে স্মরণ

করে। অতঃপর নিজের গোনাহ্ সমুহের ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকে এবং আল্লাহ্ ভিন্ন আর কে আছে, যে গোনাহ্ মাফ করিবে? আর তাহারা স্বীয় (মন্দ) কর্মে জানিয়া শুনিয়া হঠকারিতা করে না।

অতঃপর এই সকল ব্যক্তিবর্গের ছাওয়াবের বিবরণ দিয়া বলা হইয়াছে–

أُولٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ

অর্থঃ তাহাদের পুরস্কার হইবে মার্জনা তাহাদের প্রভূর নিকট হইতে এবং এমন উদ্যান যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত। তাহারা উহাতে অনন্তকাল অবস্থান করিবে এবং কত উত্তম প্রতিদান ঐ সব কর্মীদের।

পূর্বের আয়াতে বর্ণিত ومن يغفر الذنوب الا الله (এবং আল্লাহ্ ভিন্ন আর কে আছে, যে গোনাহ্ মাফ করিবে।) দ্বারা নাছারাদের এই ধারণা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইল যে, প্রাদ্রীগণ ক্ষমা করিয়া দিলেই গোনাহের মার্জনা হইয়া যাইবে।

শেষোক্ত আয়াতে ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون [আর তাহারা স্বীয় (মন্দ) কর্মে জানিয়া শুনিয়া হঠকারিতা করে না।] এখানেও এই ব্যাপারে সতর্ক করা হইয়াছে যে, বার বার গোনাহ্ করা কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কাহাকেও যদি এমন দেখা যায় যে, তওবা–এস্তেগফারও করিতেছে এবং উহার পাশাপাশি গোনাহের কাজেও লিপ্ত আছে, তবে মনে করিতে হইবে যে, সে খাঁটি অন্তরে তওবা করে নাই। কেননা, সত্যিকার তওবা উহাকেই বলা হয় যাহাতে ভবিষ্যতে গোনাহ্ না করার দৃঢ় অঙ্গীকার করা হয় এবং তওবা করিবার পরে পূর্ণ হিম্মতের সহিত গোনাহের পুনরাবৃত্তি না হওয়ার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি জরুরী কথা হইল, "তওবা করিয়া লইব" এই ভরসার উপর কোন গোনাহের কাজ করা সম্পূর্ণ হারাম। এমনিভাবে এই ধারণার উপর তওবা করিতে বিলম্ব করা যে, বর্তমানে যেহেতু আমার দ্বারা খাঁটি তওবা হইতেছে না, সুতরাং এখন গোনাহ্ করিতে থাকি,যখন বৃদ্ধ হইব

(মন–মানসিকতার পারিবর্তন ঘটিবে) তখন তওবা করিয়া লইব; এই ধরনের চিন্তা–ভাবনা নিজের উপর জুলুম ছাড়া আর কিছুই নহে। নফ্‌স আমোদ–প্রমোদ ও ভোগ–বিলাসের কারণে আর শয়তান আদম সন্তানের সহিত চির দুশমনীর কারণে মানুষকে তওবা হইতে ফিরাইয়া রাখিতে চায়। সুতরাং মানুষের চিরশত্রু নফ্‌স ও শয়তানের কথায় কখনো কান দিবে না। যখনই কোন গোনাহ্‌ হইয়া যায় সঙ্গে সঙ্গে তওবা করিয়া লওয়া কর্তব্য। ভবিষ্যতের কোন ঠিক ঠিকানা নাই। কার হায়াত কতদিন আছে কেহই বলিতে পারে না। আল্লাহ্‌ না করুন, যদি বিনা তওবায় মৃত্যুবরণ হয় তবে কঠিন আজাব ভোগ করিতে হইবে। দুনিয়ার অস্থায়ী ভোগ–বিলাসকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া পরকালের কঠিন আজাবকে সামনে রাখিবে, তাহা হইলে নফ্‌স তওবা করিতে বিলম্ব করিবে না।

খাঁটি তওবা করিবার পরও যদি দুর্ভাগ্যক্রমে কোন গোনাহ্‌ হইয়া যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে তওবা করিয়া লইবে। এইবারও খাঁটি নিয়তে তওবা করিবে। কয়েকবার এইরূপ হওয়ার পর ইনশায়াল্লাহ্‌ গোনাহের অভ্যাস ছুটিয়া যাইবে।

নিজের অপরাধ ও গোনাহের জন্য আন্তরিকভাবে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে গোনাহ্‌ না করার দৃঢ় অঙ্গীকার করা– ইহাই তওবা। তবে তওবার অপর দুইটি জরুরী বিষয় হইল, আল্লাহ্‌র হক এবং বান্দার হকের তালাফী ও ক্ষতিপূরণ করা।

হক্কুল্লাহ্‌ ও হক্কুল এবাদ আদায় করা

আল্লাহ্‌র হক এবং বান্দার হক সংক্রান্ত যেই সকল বিষয় নিজের জিম্মায় আছে উহা আদায় করাও তওবার অন্যতম অংশ। অনেকেই তওবা করেন কিন্তু হক্কুল্লাহ্‌ এবং হক্কুল এবাদ আদায়ের বিষয়ে মোটেই ফিকির করেন না। অথচ ইহা ব্যতীত তওবা কবুল হওয়া একেবারেই অসম্ভব। মানুষের হক ও আল্লাহ্‌র হক আদায় না করিয়া শুধু মুখে মুখে তওবা করিয়া মাগফেরাতের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকা নিছক বোকামি ও নিজের উপর জুলুম ছাড়া আর কিছুই নহে।

আল্লাহ্‌র হক আদায়ের বিবরণ

হুকূকুল্লাহ্‌ বা আল্লাহ্‌র হক আদায়ের মূল কথা হইল, বালেগ হওয়ার পর হইতে যেই সকল ফরজ এবং ওয়াজিব তরক হইয়াছে উহা আদায় করা। নামাজ, রোজা, হজ্ব, জাকাত– ইত্যাদি ফরজ আহকাম সমূহের যাহাই তরক হইয়াছে উহাই আদায় করিতে হইবে।

কাজা নামাজঃ

নামাজ কোন অবস্থাতেই ত্যাগ করার হুকুম নাই। সুতরাং জীবনে যত নামাজ স্বেচ্ছায় বা ভুলক্রমে এবং অসুস্থতা ও ছফর–ইত্যাদিতে ছুটিয়া গিয়াছে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উহা হিসাব করিয়া কাজা আদায় করিতে হইবে। কাজা নামাজ আদায়ের পদ্ধতি হইল, গভীরভাবে মনে মনে চিন্তা করিবে যে, বালেগ হওয়ার পর জীবনে কত নামাজ কাজা হইয়াছে। অনুমান করিয়া কাজা নামাজ সমূহের এমন একটা সংখ্যা নির্ধারণ করিবে যাহার উপর দিল সাক্ষ্য দেয় যে, আমার কাজা নামাজের সংখ্যা উহার অধিক হওয়া সম্ভব নহে। অতঃপর ঐ নামাজ সমূহের কাজা পড়িয়া লইবে।

সাধারণ মানুষের মধ্যে এমন একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, জুমাতুলবিদা বা অন্য কোন বিশেষ দিনে 'ওমরীকাজা' নামে দুই রাকাত নামাজ পড়িয়া লইলে জীবনের সকল কাজা নামাজ আদায় হইয়া যায়। ইহা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। কাজা নামাজ আদায়ের কোন নির্দিষ্ট সময় নাই। সূর্যের উদয়–অস্ত ও ঠিক দ্বিপ্রহর ছাড়া অন্য সকল সময়ই কাজা নামাজ পড়া যায়। সূর্য উদয় হইয়া যখন উহা এক বর্শা পরিমাণ উপরে ভাসিয়া উঠে তখন হইতেই কাজা ও নফল নামাজ পড়া যায়। আছর নামাজের পর নফল নামাজ পড়া যায় না। কিন্তু কাজা নামাজ পড়া যায়। তবে সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বক্ষণে যখন উহা রক্তিমবর্ণ ধারণ করে তখন কাজা নামাজও প'ড়া যায় না।

এক দিনের ফরজ নামাজ ১৭ রাকাত এবং ৩ রাকাত বিতির– এই হিসাবে প্রতি দিনের বরাবরে মোট ২০ রাকাত কাজা আদায় করিবে। আর মুছাফির হালাতে চার রাকাতের ফরজ নামাজ যেহেতু দুই রাকাত (কছর) পড়িতে হয় তাই ঐ চার রাকাতের কাজাও দুই রাকাতই পড়িতে হইবে (যদিও উহা ঘরে বসিয়াই আদায় করা হইতেছে।)

এখানে আরেকটি লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল, কাজা নামাজের সকল ওয়াক্তের নামাজ যে সমান সংখ্যক হইবে ইহা জরুরী নহে। বরং সকল

ওয়াক্তের সংখ্যা সমান না হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা, সকল মানুষের অবস্থা এক রকম নহে। কেহ ফজর নামাজ বেশী কাজা করিয়া থাকেন, কেহ আছর নামাজ, কাহারো হয়ত জোহরের নামাজই বেশীর ভাগ ছুটিয়া যায়। তা ছাড়া অনেকেই হয়ত স্বাভাবিক অবস্থায় নামাজ ঠিকই পড়েন কিন্তু ছফর ও বিমারীর হালাতে নামাজ ছাড়িয়া দেন। মোট কথা, কাজা নামাজের সকল ওয়াক্তের সংখ্যা সমান না হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং যেই ওয়াক্তের নামাজ যেই পরিমাণ কাজা হইয়াছে যথা সম্ভব সঠিক অনুমান করিয়া সেই পরিমাণই আদায় করিতে হইবে।

সাধারণ মানুষের মধ্যে আরেকটি ভুল ধারণার প্রচলন হইল, যেই ওয়াক্তের নামাজ সেই ওয়াক্তেই আদায় করিতে হইবে। অর্থাৎ জোহরের কাজা জোহরের সময় এবং আছরের কাজা আছরের সময়ই আদায় করিতে হইবে। এই ধারণা সঠিক নহে। যে কোন ওয়াক্তের নামাজ যে কোন সময়ই আদায় করা যাইবে। এমনিভাবে এক দিনে কায়েক দিনের কাজা নামাজ আদায় করিতেও কোন বাঁধা নাই। পাঁচ ওয়াক্তের বেশী নামাজ যদি কাজা হইয়া থাকে তবে সেই ক্ষেত্রে কাজা আদায়ের সময় নামাজের ধারাবাহিকতা রক্ষা করাও জরুরী নহে। আছরের নামাজ আগে এবং জোহরের নামাজ পরে আদায় করিলেও কোন ক্ষতি নাই।

অনেকেই বিশেষ গুরুত্বের সহিত নফল নামাজ আদায় করিয়া থাকেন অথচ তাহাদের জিম্মায় হয়ত বছরের পর বছরের কাজা নামাজ রহিয়া গিয়াছে, কিন্তু উহা আদায়ের ব্যাপারে কোন ফিকির করেন না। ইহা বড় দুর্ভাগ্যের কথা। নফল ও সুন্নতে গায়রে মোআক্কাদার স্থলে কাজা নামাজ পড়া উচিৎ। ইহা ছাড়াও কাজা নামাজের জন্য ভিন্নভাবে সময় বাহির করিয়া লইবে। সম্পূর্ণ কাজা নামাজ আদায়ের পূর্বে যদি মৃত্যু আসিয়া পড়ে তবে কঠিন আজাবের শিকার হইতে হইবে।

জীবনে কত দিন কত ওয়াক্ত নামাজ কাজা হইয়াছে উহার সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা যদি সম্ভব না হয় তবে সেই ক্ষেত্রে কাজা নামাজ আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে ফেকাহশাস্ত্রবিদগণ বলিয়াছেন, যেই নামাজের কাজা পড়িবে সেই নামাজ জীবনে যত ওয়াক্ত কাজা হইয়াছে প্রথমে উহার সর্ব প্রথম ওয়াক্তের নিয়ত করিবে। যেমন জোহরের কাজা আদায়ের সময় এইরূপ নিয়ত করিবে যে, আমার জীবনে জোহরের যত ওয়াক্ত ফরজ কাজা হইয়াছে, উহার সর্বপ্রথম ওয়াক্তের কাজা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আদায় করিতেছি। অন্যান্য নামাজের বেলায়ও এইভাবেই নিয়ত করিবে। এই পদ্ধতি অনুসরণ করিলেই ওয়াক্ত সমূহের তরতীব ও ধারাবাহিকতা ঠিক থাকিবে।

জাকাত আদায়

জাকাত ফরজ হইবার পর যদি উহা আদায় করা না হইয়া থাকে তবে উহারও কাজা আদায় করিতে হইবে। সুতরাং ভাল করিয়া খেয়াল করিবে, জীবনে কখনো জাকাত ফরজ হইয়াছিল কি-না। যদি হইয়া থাকে তবে উহা আদায় করা হইয়াছে কি-না। কোন বছরের জাকাত হয়ত পূর্ণই অনাদায় রহিয়া গিয়াছে, আবার কোন বছরের হয়ত আংশিক আদায় হইয়াছে। অর্থাৎ নিজের জিম্মায় কি পরিমাণ জাকাত আদায় করা হয় নাই উহার সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করিতে পারিলে ভাল, অন্যথায় অনুমান করিয়া উহার পরিমাণ নির্ণয়ের পর মন যখন পরিপূর্ণ আস্থার সহিত এই কথা সাক্ষ্য দিবে যে, আমার জাকাত ইহার অধিক হওয়া সম্ভব নহে তখন ঐ পরিমাণ জাকাত প্রকৃত প্রাপকদিগকে দান করিয়া দিবে। এক সঙ্গেও আদায় করা যাইবে অথবা অল্প অল্প করিয়াও আদায় করিতে পারিবে। যদি সামর্থ্য থাকে তবে এক সঙ্গে আদায় করিয়া ফেলাই ভাল। সামর্থ্য না থাকিলে যখন যেই পরিমাণ সম্ভব আদায় করিবে এবং পাক্কা নিয়ত রাখিবে যে, আমার জীবনে যত জাকাত ফরজ হইয়াছে আমি অবশ্যই উহা আদায় করিব। অতঃপর যখনই হাতে অর্থ আসিবে তখনই সাধ্য মত উহা আদায় করিবে। এই বিষয়ে অবহেলা করিবে না।

ফেৎরা আদায় করাও ওয়াজিব। সুতরাং কোন বছরের ফেৎরা যদি অনাদায় থাকে তবে উহাও আদায় করিতে হইবে। এমনিভাবে মান্নত আদায় না করিয়া থাকিলে উহাও আদায় করিতে হইবে। তবে কোন নাজায়েজ বিষয়ের মান্নত করাও পাপ এবং উহা আদায় করাও পাপ। এই ধরনের কোন জটিল বিষয় সামনে আসিলে অভিজ্ঞ আলেমের নিকট উহার মাসআলা জিজ্ঞাসা করিয়া লইবে।

কাজা রোজা

বালেগ হওয়ার পর হইতে যত রোজা কাজা হইয়াছে অথবা অসুস্থতা ও

ছফরের কারণে যেই সকল রোজা ছুটিয়া গিয়াছে ঐ সমুদয় রোজার সংখ্যা হিসাব করিয়া উহার কাজা আদায় করিতে হইবে। কাজা রোজা আদায়ের মাসআলা আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লইবে। মহিলাদের 'মাসিক ঋতু' অবস্থায় নামাজ পড়া ও রোজা রাখা জায়েজ নহে। শরীয়তের বিধান মতে ঋতুকালের নামাজ সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ঐ দিবসগুলির রোজা পরে কাজা আদায় করিতে হইবে। এই ব্যাপারে মহিলারা বড় অবহেলা করিয়া থাকে। খামখেয়ালী ও অলসতা করিয়া ঋতুকালীন কাজা রোজাসমূহ পরে আর আদায় করা হয় না। ফলে দেখা যায়, কোন কোন মহিলার জিম্মায় কয়েক বছরের কাজা রোজা জমিয়া থাকে। অথচ উহা আদায়ের ব্যাপারে কোন খেয়ালই করা হয় না। এই সকল রোজার জন্য কঠিন আজাব ভোগ করিতে হইবে। সুতরাং যদি জানা থাকে তবে কাজা রোজার সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করিয়া উহার কাজা আদায় করিবে। আর সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করা সম্ভব না হইলে সঠিক অনুমানের ভিত্তিতে উহার হিসাব বাহির করিবে। মোট কথা, (যেই কারণেই হউক) বালেগ হওয়ার পর হইতে এই যাবত যত রোজা কাজা হইয়াছে ঐ সমুদয় রোজার কাজা আদায় করিতে হইবে। পুরুষদের ক্ষেত্রেও একই হুকুম, জীবনে যত রোজা কাজা হইয়াছে উহা আদায় করিতে হইবে।

হজ্ব আদায় করা

অনেক নারী-পুরুষই হজ্বের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্ব আদায় করেন না। যাহাদের উপর হজ্ব ফরজ হইয়াছে, অথবা পূর্বে কখনো ফরজ হইয়াছিল কিন্তু তখন হজ্ব আদায় না করিয়া টাকা-পয়সা অন্য কোন কাজে খরচ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাদের ফরজ হজ্ব অবশ্যই আদায় করিতে হইবে। যদি কাহারো উপর হজ্ব ফরজ হইয়া থাকে আর সে বার্ধক্যজনিত কারণে অথবা অসুস্থতার কারণে বর্তমানে এতটা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, মৃত্যুর পূর্বে হজ্বের ছফর করিবার মত সুস্থতা ফিরিয়া আসিবে বলিয়া ভরসা হয় না, তবে এই ক্ষেত্রে নিজের পক্ষ হইতে অপর কাহাকেও পাঠাইয়া "বদলী হজ্ব" করাইয়া লইবে। জীবদ্দশায় করাইতে না পারিলে মৃত্যুর পূর্বে ওয়ারিশগণকে অসিয়ত করিয়া যাইবে যেন তাহার মাল হইতে হজ্ব করানো হয়। শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ত্যাজ্য সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের উপরই অসিয়ত করা যাইবে, উহার বেশী

নহে। তবে বালেগ ওয়ারিশগণ ইচ্ছা করিলে তাহাদের নিজেদের অংশ হইতে মৃতের জন্য খরচ করিতে পারিবে।

বান্দার হক আদায়ের বিবরণ

হুকূকুলএবাদ বা বান্দার হক আদায়ের মূল কথা হইল, মানুষের যেই সকল হক নষ্ট করা হইয়াছে উহা সম্পূর্ণরূপে আদায় করা। বান্দার হক দুই প্রকার- ১। মালের হক। ২। মান-সম্ভ্রমের হক।

মালের হক

মালের হকের অর্থ হইল, কাহারো কোন সম্পদ (তাহার জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে) হস্তগত করিয়া থাকিলে উহা ফেরৎ দেওয়া। যেমন কাহারো কোন সম্পদ চুরি করিয়া বা ডাকাতি করিয়া আনা হইল কিংবা করজ লইয়া আর ফেরত দেওয়া হইল না (করজদাতার স্মরণে থাকুক বা না থাকুক) এমনিভাবে সুদ, ঘুষ আমানতের খেয়ানত বা খেলাচ্ছলে ও দুষ্টামী করিয়া কাহারো কোন বস্তু (তাহার অসম্মতিতে) রাখিয়া দেওয়া- এই ধরনের যাবতীয় সম্পদ মালিকের নিকট ফিরাইয়া দিতে হইবে।১

১। ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলেন, বন্দার হক সমূহের মধ্যে যদি কাহারো ধন-সম্পদ চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা আত্মসাৎ, ঠকানো ইত্যাদির মাধ্যমে বিনষ্ট করে তবে উহা হইতে তওবার বিশেষ পদ্ধতি রহিয়াছে। ইহাতে প্রাপ্তবয়স্ক ও অপ্রাপ্তবয়স্ক সকলেই সমান; অর্থাৎ সকলকেই তওবা করিতে হইবে। সুতরাং জীবনের শুরু হইতে তওবার দিন পর্যন্ত পাই পাই করিয়া হিসাব করিবে এবং দেখিবে যে, তাহার জিম্মায় কাহার কত পাওনা আছে। অতঃপর এই সকল পাওনা নামে নামে লিপিবদ্ধ করিবে এবং পাওনাদারদের খোঁজে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িবে। অতঃপর যাহার যাহা পাওনা, তাহা শোধ করিয়া দিবে অথবা আদায় করা সম্ভব না হইলে তাহাদের নিকট হইতে মাফ করাইয়া লইবে। যদি যথাসাধ্য চেষ্টার পর সকল পাওনাদার অথবা তাহাদের ওয়ারিশদেরকে তালাশ করা সম্ভ না হয়, তবে বিপুল পরিমাণে নেক আমল করিবে, যাহাতে কেয়ামতের দিন এই নেক আমলের ছাওয়াব দিয়া পাওনাদারদের পাওনা শোধ করা যায়। সুতরাং মানুষের পাওনা পরিমাণ অনুযায়ী নেক আমল করিবে, যাহাতে কেয়ামতের দিন এই নেক আমলের ছাওয়াব দিয়া ঐ ঋণ শোধ করা যায়। যদি নেক আমল দ্বারা সকল পাওনা শোধ না হয়, তবে পাওনাদারদের গোনাহ্ তাহার মাথায় চাপাইয়া দেওয়া হইবে। ফলে সে অপরের গোনাহের বদলে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করিবে। যদি কহারো ধন-সম্পদে হালাল-হারাম মিশিয়া যায়, তবে আন্দাজ করিয়া হারাম মাল বাহির করিয়া খয়রাত করিয়া দিবে। -অনুবাদক কর্তৃক সংগৃহীত।

মাল ফেরৎ দেওয়ার সময় এই কথা বলা জরুরী নহে যে, আমি আপনার খেয়ানত করিয়াছিলাম। বরং হাদিয়ার নাম করিয়া দিলেও আদায় হইয়া যাইবে।

মান—সম্ভ্রমের হক

মান–সম্ভ্রমের হক আদায়ের অর্থ হইল, কাহাকেও অন্যায়ভাবে আঘাত করা, গীবত করা, গীবত শোনা, গালী দেওয়া, অপবাদ দেওয়া১ অথবা অন্য কোন উপায়ে কাহাকেও দৈহিক, মানসিক বা আত্মিকভাবে কষ্ট দিয়া থাকিলে তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। যাহার হক নষ্ট করা হইয়াছে সে যদি অনেক দূরে থাকে তবে ইহাকে ওজর মনে করা চলিবে না। বরং তাহার নিকট গমন করিয়া অথবা প্রত্রযোগে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। মোট কথা, যেইভাবেই হউক ক্ষমা চাহিয়া তাহাকে রাজী করাইবে। যদি অন্যায়ভাবে প্রহারের বদলায় সেই ব্যক্তিও প্রহার করিতে চায় তবে উহাতেও আপত্তি করিবে না।

১। কুৎসা রটনা, গীবত ইত্যাদির মাধ্যমে অপরের মনে কষ্ট দিলে উহার তওবা এই যে, যাহাদের মনে কষ্ট দিয়াছে তাহাদের সকলকে তালাশ করিয়া ক্ষমা করাইয়া লইবে। তাহাদের কেহ যদি মারা গিয়া থাকে অথবা নিরুদ্দেশ থাকে সেই ক্ষেত্রে এই পরিমাণ নেক আমল করিবে যেন পরকালে ইহা দ্বারা বিনিময় দেওয়া যায়। যাহাকে তালাশ করিয়া পাওয়া যায় সে যদি মনের খুশিতে ক্ষমা করিয়া দেয় তবে উহা ঐ অপরাধের কাফ্ফারা হইয়া যাইবে। কিন্তু যেই অপরাধ করা হইয়াছে এবং মুখে যাহা বলা হইয়াছে, ক্ষমা চাওয়ার সময় উহা বর্ণনা করা ওয়াজিব। অস্পষ্ট ক্ষমা করানো যথেষ্ট হইবে না। কেননা, এমনও হয় যে, নিজের উপর অপরের বাড়াবাড়ির কথা জানার পর ক্ষমা করিতে মন চায় না এবং কেয়ামতেই বিনিময় নেওয়ার কথা চিন্তা করা হয়। তবে যদি এমন কোন অপরাধ করিয়া থাকে যাহা বর্ণনা করিলে প্রতিপক্ষ মনে ব্যথা পাইবে, তবে বুঝিতে হইবে যে, ক্ষমা করানোর পথ রুদ্ধ। তবে ইহা সম্ভব যে, অস্পষ্ট ক্ষমা করাইয়া লইবে এবং অবশিষ্ট ত্রুটিসমূহ নেক আমল দ্বারা পূরণ করিয়া লইবে। অপরাধ উল্লেখ করিবার পর প্রতিপক্ষ যদি ক্ষমা করিতে সম্মত না হয় তবে শাস্তি অপরাধীর ঘাড়ে থাকিয়া যাইবে। কেননা প্রতিপক্ষের হক এখনো বহাল রহিয়াছে। এমতাবস্থায় অপরাধীর কর্তব্য হইল, তাহার সহিত নম্র ব্যবহার করা, তাহার খেদমত করা এবং তাহার প্রতি ভালবাসা ও সৌহার্দ্য প্রকাশ করা। ফলে প্রতিপক্ষের মন তাহার প্রতি নরম হইবে এবং শেষ পর্যন্ত সে ক্ষমা করিতে সম্মত হইবে। যদি ইহাতেও সে ক্ষমা না করে তবে এই নম্র ব্যবহার বিফলে যাইবে না, কেয়ামতে উহার বিনিময় পাওয়া যাইবে।

—এহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন হইতে সংগৃহীত। —অনুবাদক

গীবত সম্পর্কে আমাদের আকাবের ও বজুর্গানে দ্বীন বলিয়াছেন, যাহার গীবত করা হইয়াছে এই ব্যাপারে সে যদি অবগত হইয়া থাকে তবে তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে, অন্যথায় তাহার জন্য বেশী বেশী মাগফেরাতের দোয়া করিতে থাকিবে। যখন মনে এমন ধারণা জন্মাইবে যে, যেই পরিমাণ গীবত করা হইয়াছে অথবা গীবত শোনা হইয়াছে উহার বিনিময়ে তাহার জন্য এত অধিক দোয়া করা হইয়াছে যে, যখন সে ঐ দোয়া দেখিতে পাইবে তখন অবশ্যই খুশী হইবে এবং ঐ গীবত ক্ষমা করিয়া দিবে- তখন মনে করিতে হইবে যে, এই অপরাধের ক্ষতিপূরণ হইয়াছে।

একটি কথা সর্বদা স্মরণ রাখিবে যে, শুধু তওবা দ্বারা বান্দার হক কখনো ক্ষমা হইবে না। আর বালেগ হওয়ার পূর্বে রোজা–নামাজ ফরজ হয় না বটে কিন্তু ঐ সময় যদি কোন মানুষের হক নষ্ট করা হয় তবে উহা ক্ষমা করা হইবে না। যদি কোন নাবালেগ ছেলে বা মেয়ে অপর কাহারো কোন আর্থিক ক্ষতিসাধন করিয়া থাকে তবে তাহার ওলী বা অভিভাকের কর্তব্য হইল, সে তাহার অধীন ঐ ছেলে বা মেয়ের মাল হইতে উহার ক্ষতিপূরণ করিয়া দিবে। যাহার ক্ষতি করা হইয়াছে সে যদি এই ক্ষতি সম্পর্কে জানিতে নাও পারে তবুও উহা আদায় করিতে হইবে। যদি ওলী নাবালেগের পক্ষ হইতে ঐ হক আদায় না করে তবে সেই নাবালেগ বালেগ হওয়ার পর নিজে উহা আদায় করিবে অথবা তাহার নিকট ক্ষমা চাহিবে।

এক ধরনের লোক আছে যাহারা প্রকাশ্যে দ্বীনদার বলিয়া গণ্য এবং সর্বদা মৌখিক তওবা করিয়া থাকে, কিন্তু গোনাহ্ ও পাপের কাজ ত্যাগ করে না। অবৈধ ও হারাম উপায়ে অর্থ উপার্জন করা হইতেছে, মানুষের গীবত করাকে জায়েজ মনে করিতেছে, অথচ মনে একটুও ভাবান্তর হইতেছে না যে, আমি হারাম কামাই করিতেছি, মানুষের গীবত করিতেছি। তাহাদের দ্বীনদারী যেন শুধু টুপী–দাড়ি, সুন্নতী জামা ও নামাজ আদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। গোনাহ্ ও পাপের কাজ ত্যাগ না করিয়া এবং হক্কুল্লাহ্ ও হক্কুল এবাদ আদায় না করিয়া শুধু মুখে তওবা! তওবা!! করিলেই নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে না। বিশেষতঃ যাহারা সুদ–ঘুষ গ্রহণ করে, ব্যবসার মধ্যে ধোঁকাবাজী করিয়া অর্থ উপার্জন করে তাহাদের অবস্থা বড় কঠিন। যত মানুষের হক নষ্ট করা হইয়াছে,

তাহাদের সকলের হক আদায় করিতে হইবে। ব্যবসার ক্ষেত্রে অসদুপায় অবলম্বন করিয়া হয়ত এমন অসংখ্য মানুষের হক নষ্ট করা হইয়াছে যাহাদের নাম-ঠিকানা কিছুই জানা নাই। জীবনে হয়ত একবারই তাহাদের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল আর ঐ সুযোগেই তাহাদের হক নষ্ট করা হইয়াছে, বর্তমানে তাহারা কে কোথায় আছে, বাঁচিয়া আছে কি মরিয়াছে, কিছুই জানা নাই। এক্ষণে তাহাদের সকলকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহাদের হক আদায় করা সহজ ব্যাপার নহে। পাহাড় কাটিয়া চূর্ণ করা সম্ভব কিন্তু এই সমস্যার সমাধান হওয়া বড় কঠিন। তবে যাহাদের অন্তরে পরকালের কঠিন আজাবের একীন বদ্ধমূল হইয়া বসিয়াছে, তাহারা যে কোনভাবেই হউক হকদারদের হক আদায় করিবেই।

আমাদের এক উস্তাদ জনৈক তহ্সীলদারের ঘটনা শুনাইতেন। ঐ তহ্সীলদার হযরত থানভী (রহঃ)-এর নিকট মুরীদ হইবার পর যখন তাহার মধ্যে দ্বীনদারী আসিল তখন তিনি পরকালের আজাবের ভয়ে হক্কুল এবাদ আদায়ের ব্যাপারে মানোযোগী হইলেন। সম্ভবতঃ তিনি পাঞ্জাবের তহসীলদার ছিলেন। সেই কর্মস্থলে গমন করিয়া তাহার জমানার পুরাতন ফাইল-পত্র তন্ন তন্ন করিয়া ঘাঁটিয়া যত মানুষের নিকট হইতে ঘুষ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদের মোকদ্দমার কাগজ-পত্র হইতে তাহাদের নাম-ঠিকানা বাহির করিলেন। অতঃপর গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাত করিয়া কাহারো নিকট ক্ষমা চাহিলেন আবার কাহাকেও নগদ অর্থ দিয়া দায়মুক্ত হইলেন।

ঐ তাহ্সীলদারের সঙ্গে আমাদের উস্তাদ ছাহেবের সাক্ষাত হইয়াছিল। তহ্সীলদার নিজেই ঐ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছিলেন।

একটি প্রশ্নের জবাব

কেহ হয়ত প্রশ্ন করিতে পারেন, কোন ব্যক্তি এক সময় হয়ত মানুষের অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছে কিন্তু বর্তমানে তাহার নিকট কোন অর্থ-সম্পদ নাই, সুতরাং এই ব্যক্তি কিভাবে মানুষের হক আদায় করিবে? অথবা তাহার নিকট অর্থ-সম্পদ আছে বটে কিন্তু যাহাদের হক নষ্ট করা হইয়াছে, তাহাদের নাম ঠিকানা জানা নাই, খুঁজিয়া বাহির করাও সম্ভব নহে; এক্ষণে সে কি করিয়া তাহাদের হক আদায় করিবে?

উপরোক্ত সমস্যার সহজ সমাধান হইল, যাহাদের হক নষ্ট করা হইয়াছে তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাত করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে অথবা পত্রযোগে ক্ষমা চাহিবে। তাহাদিগকে এমনভাবে খুশী করিবে যেন নিশ্চিতভাবে ধারণা করা যায় যে, প্রকৃত অর্থেই তাহারা ক্ষমা করিয়া দিয়াছে। যদি ক্ষমা না করে তবে কিছু সময় চাহিয়া লইবে এবং নিজের উপার্জিত অর্থ হইতে সামান্য সামান্য বাঁচাইয়া তাহাদের হক আদায় করিবে। হক আদায় হইবার পূর্বেই যদি পাওনাদারদের কেহ ইন্তেকাল করে তবে অবশিষ্ট অর্থ তাহার সন্তানদিগকে দিয়া দিবে।

পক্ষান্তরে পাওনাদারদের মধ্যে যাহারা জীবিত আছে তাহাদের মধ্যে যাহাদের ঠিকানা জানা নাই তাহাদের হকের সম পরিমাণ অর্থ মিছকীনদিগকে ছদকা করিয়া দিবে। যত দিন সকলের ছদকা আদায় না হইবে, ততদিন ছদকা করিতে থাকিবে এবং সকল পাওনাদারদের জন্য নিয়মিত দোয়া-এস্তেগফার করিতে থাকিবে।

হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা কি জান, গরীব কাহাকে বলে? ছাহাবাগণ আরজ করিলেন, আমরা তো ঐ ব্যক্তিকেই গরীব মনে করি, যাহার নিকট দেরহাম ও সম্পদ নাই। ইহা শুনিয়া নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমার উম্মতের মধ্যে (প্রকৃত) গরীব হইবে ঐ ব্যক্তি, যে কেয়ামতের দিন নামাজ, রোজা এবং জাকাত লইয়া হাজির হইবে (অর্থাৎ দুনিয়াতে সে নিয়মিত নামাজ পড়িয়াছে, রোজ রাখিয়াছে এবং জাকাতও আদায় করিয়াছে) কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও সে এমন অবস্থায় (হাশরের মাঠে) উপস্থিত হইবে যে, সে হয়ত কাহাকেও গালি দিয়াছে, কাহারো নামে অপবাদ দিয়াছে, অন্যায়ভাবে কাহারো অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছে অথবা কাহাকেও হত্যা করিয়াছে বা প্রহার করিয়াছে (আর কেয়ামতের দিন যেহেতু বিচার দিবস) সুতরাং তাহার বিচার এইভাবে করা হইবে যে, তাহার নেকীসমূহ তাহার হকদারদের সকলের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হইবে। এই পর্যায়ে সকলের হক পূর্ণ হইবার পূর্বেই যদি তাহার নেকী ফুরাইয়া যায় তবে হকদারদের গোনাহ্সমূহ তাহার মাথায় চাপাইয়া দিয়া তাহাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে। -মুসলিম শরীফ।

অন্য হাদীসে রাসুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি তাহার কোন ভাইয়ের অসম্মান করিল অথবা অন্য কোন উপায়ে তাহার হক নষ্ট করিয়া তাহার উপর জুলুম করিল, সে যেন ঐ দিনের পূর্বেই তাহার হক আদায় করিয়া দেয় অথবা ক্ষমা করাইয়া লয়– যেই দিন কোন দিনার ও দেরহাম কিছুই থাকিবে না। অতঃপর এরশাদ করিলেন, যদি তাহার সঙ্গে কোন নেক আমল থাকে তবে যেই পরিমাণ জুলুম করা হইয়াছে সেই পরিমাণ নেকী লইয়া লওয়া হইবে। আর যদি নেকী না থাকে তবে মজলুমের গোনাহ্সমূহ তাহার মাথায় চাপাইয়া দেওয়া হইবে।

–বোখারী শরীফ

উপরোক্ত দুইটি হাদীস দ্বারা জানা গেল যে,শুধু অবৈধ উপায়ে টাকা–পয়সা উপার্জন করাই জুলুম নহে, বরং অন্যায়ভাবে কাহাকেও গালি দেওয়া, প্রহার করা, মানহানী করা ইত্যাদিও জুলুম এবং বান্দার হক নষ্ট করার অন্তর্ভুক্ত। অনেকেই নিজেকে দ্বীনদার মনে করিতেছেন অথচ উপরোক্ত বিষয় হইতে পরহেজ করিয়া চলেন না। প্রকৃত অবস্থা হইল, আল্লাহর হক তওবা ও এস্তেগফার দ্বারা ক্ষমা হইতে পারে কিন্তু শুধু তওবা করিলেই বান্দার হক ক্ষমা করা হইবে না। বান্দার হক বান্দাকে ফিরাইয়া দিতে হইবে অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমা করাইয়া লইতে হইবে।

ক্ষমার বিষয়ে আরেকটি জরুরী বিষয় হইল, হকদার খুশী মনে ও সন্তুষ্টচিত্তে ক্ষমা করিলেই উহা গ্রহণযোগ্য হইবে। শুধু ভদ্রতার খাতিরে মুখে মুখে ক্ষমা করিয়া দেওয়া অথবা এই কারণে (বাহ্যিক) ক্ষমার কথা বলিয়া দেওয়া যেন তাহার সহিত সম্পর্কের অবনতি না ঘটে– এই জাতীয় ক্ষমার কোন মূল্য নাই।

দিল্লীতে আমি অধমের নিকট এক ব্যক্তি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বন্ধু–বান্ধবের নিকট আমার কিছু করজ ছিল, তাহারা আমার ঐ করজ ক্ষমা করিয়া দিয়াছে, সুতরাং আমার ঐ করজ ক্ষমা হইয়াছে কি? উত্তরে আমি বলিলাম, তাহারা ক্ষমা করিয়া দিবার পরও আপনার মনে সন্দেহ হইতেছে কেন? আপনার মনের এই সন্দেহই প্রমাণ করিতেছে যে, তাহারা খুশি মনে আপনাকে ক্ষমা করে নাই। আমি আরো জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার করজ ক্ষমা করিয়া দিবার পর কাহরো নিকট তাহারা এমন মন্তব্য করিয়াছে কি যে, অমুক

ব্যক্তি আমাদের অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছে। ? উত্তরে সে বলিল, হাঁ! তাহারা এই ধরনের মন্তব্য করিয়াছে। আমি বলিলাম, ক্ষমা করিয়া দিবার পরও আপনার বিরুদ্ধে এই অভিযোগের অর্থ হইল, তাহারা সন্তুষ্টচিত্তে আপনাকে ক্ষমা করে নাই। কোন কারণে শুধু উপরে উপরে ক্ষমার কথা বলিয়াছে মাত্র। এই ক্ষমা গ্রহণযোগ্য নহে। সুতরাং আপনি আপনার করজ আদায়ের ব্যাপারে ফিকির করুন।

হুকুকুল এবাদ সংক্রান্ত জরুরী জ্ঞাতব্য

এক

যেই সকল লোক কোন মসজিদ বা ওয়াক্ফ সম্পত্তির মোতাওয়াল্লী কিংবা কোন মাদ্রাসার মোহ্তামিমের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন, তাহারা অত্যন্ত সতর্কতার সহিত নিজেদের দায়িত্ব পালন করা উচিৎ। ওয়াক্ফকারীর উদ্দেশ্য ও শর্ত অনুযায়ী তাহার সম্পদ ব্যবহার করিতে হইবে। এমনিভাবে জনসাধারণ হইতে উসুলকৃত চাঁদার অর্থও দাতাগণ যেই কাজে দিয়াছেন সেই কাজেই ব্যয় করিতে হইবে। অনেকেই এই সকল বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে এবং ক্ষেত্র বিশেষে জানিয়া শুনিয়াই এমন সব কর্ম–কাণ্ড করিয়া থাকেন যাহা তাহাদের জন্য পরকালের আজাবের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে।

অনেকেই মসজিদ–মাদ্রাসার মোহাচ্ছেল বা চাঁদা সংগ্রহকারীদের নিকট হইতে রশিদ গ্রহণ করেন না। আবার কেহ কেহ যথারীতি রশিদ গ্রহণ করিলেও রশিদের যেই অংশটি মাদ্রাসায় জমা দেওয়া হইবে উহাতে কি লেখা হইয়াছে তাহা যাচাই করিয়া দেখেন না। এই পদ্ধতিতে সংগৃহীত চাঁদার অর্থ আত্মসাৎ করা বড় সহজ। অন্তরে পরকালের আজাব ও জবাবদিহির ভয় না থাকিলে এই সুযোগে শয়তান মানুষের দ্বারা খেয়ানত করাইয়া বসে।

ঈদগাহ অথবা অন্য কোন বড় সমাবেশে ঘোষণা দিয়া চাঁদা উঠানো হয়। এই সকল ক্ষেত্রে সাধারণতঃ রশিদ দেওয়া হয় না। উসুলকৃত সকল অর্থ দায়িত্বশীলদের নিকট জমা হয়। তাহারা যদি আমানতদার না হন তবে ঐ অর্থ হইতে ইচ্ছামত আত্মসাৎ করিতে পারিবেন। আজ–কাল এই ধরনের বহু অপ্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত হইতেছে। ওয়াকফের সম্পদ অন্যায়ভাবে নিজে ভোগ করিতেছে এবং নিজের আওলাদ ফরজন্দের মধ্যেও বিলাইয়া দেওয়া

হইতেছে। কোন ব্যক্তিবিশেষের আত্মসাতের তুলনায় মসজিদ-মাদ্রাসার অর্থ আত্মসাৎ করা অধিকতর ভয়াবহ। কেননা, ব্যক্তিবিশেষের অর্থ ফেরৎ দেওয়া বা ক্ষমা চাহিয়া লওয়া সহজ। কিন্তু জনসাধারণের অর্থ আত্মসাতের পর তাহাদের সকলের নিকট তাহাদের অর্থ ফেরৎ দেওয়া বা ক্ষমা লাভ করা সহজ নহে। স্বীয় অপরাধের উপর অনুশোচনা সৃষ্টি হইবার পরও হকদারদের পরিচয়ের অভাবে তাহাদের হক ফেরৎ দিবার কোন উপায় থাকিবে না।

কাহারো প্রতি বিদ্বেষ এবং কোন প্রকার সমালোচনার উদ্দেশ্যে নহে, বরং সকলের খায়েরখাহী ও কল্যাণ কামনা করিয়া একান্তই আত্মসচেতনতা ও আত্মসমালোচনা মূলকভাবে উপরোক্ত বিষয়গুলির প্রতি সাধারণভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইল। এই ধরনের গর্হিত অপরাধে যাহারা লিপ্ত তাহারা নিজেরাই নিজেদের কথা বিবেচনা করুন। অপরের আমানতের মাল যাহারা অবৈধভাবে নিজের জন্য খরচ করিতেছেন তাহারা আখেরাতের ভয়াবহ পরিণতির কথা চিন্তা করুন।

দুই

এই কথা সকলেরই জানা আছে যে, শরীয়তের হুকুম অমান্য করিয়া এতীমের মাল ভক্ষণ করা বা উহা দখল করিয়া নিজের জন্য বা নিজের পরিবার পরিজনের জন্য খরচ করা কঠিন গোনাহ্ ও সম্পূর্ণ হারাম। কালামে পাকে এরশাদ করা হইয়াছে-

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ
نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا -

অর্থঃ নিশ্চয়ই যাহারা এতীমদের মাল অন্যায়ভাবে ভোগ করে তাহারা নিজেদের উদরে অগ্নি ভিন্ন আর কিছুই পুরিতেছে না এবং অতি সত্বরই তাহারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করিবে।

যাহারা বিভিন্ন এতীমখানার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া জনগণ হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন তাহারা কালামে পাকের উপরোক্ত ঘোষণার প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। এতীমদের অর্থ হইতে যাহা নিজের জন্য গ্রহণ করা হইতেছে তাহা যেন কোন অবস্থাতেই স্বীয় শ্রমের তুলনায় অতিরিক্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সতর্কতা, সততা ও আমানতদারীর হিসাব-নিকাশ এই দুনিয়াতেই করিয়া ফেলুন। যদি কোন প্রকার অসতর্কতা ও অবহেলা হইয়া থাকে তবে সময় থাকিতে উহা সমাধা করিয়া ফেলুন।

অনেকেই আবার মনে করিতে পারেন, যাহারা এতীম খানার দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত শুধু তাহাদের দ্বারাই এতীমদের সম্পদ আত্মসাৎ হইয়া থাকে। এই ধারণা সঠিক নহে। সমাজের ঘরে ঘরে আজ এতীমদের সম্পদ ও অধিকার হরণ করা হইতেছে। পিতার ইন্তেকালের পর শরীয়তের সঠিক বিধান অনুযায়ী সন্তানদের মধ্যে মিরাছ বন্টন হইতেছে না। চাচা বা বড় ভাই যাবতীয় সম্পদ হস্তগত করিয়া ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্য নামে মাত্র খরচ করেন। আবার ক্ষেত্র বিশেষ এতীমদিগকে পিতৃসম্পদের কোন অংশই দেওয়া হয় না। এইভাবে আজ সমাজের ঘরে ঘরে এতীমদিগকে বঞ্চিত করিয়া তাহাদের সম্পদ আত্মসাৎ করা হইতেছে।

তিন

সমাজে দ্বীনদার বলিয়া পরিচিত এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যাহারা মৃত ভাইয়ের সম্পদ হইতে তাহার বিধবা স্ত্রীকে অংশ দেন না। ভাইয়ের যাবতীয় সম্পদ দখলের উদ্দেশ্যে বিধবাকে তাহার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে রাজী হইতে চাপ প্রয়োগ করা হয়। অসহায় বিধবাও বাধ্য হইয়া বিবাহে রাজী হয়। এই বিবাহের ফলে মনে করা হয় যে, এক্ষণে মৃত ভাইয়ের সম্পদ বন্টনের সকল ঝামেলা চুকিয়া গেল। অথচ ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করিলেই তাহার স্বামীর পক্ষ হইতে প্রাপ্য মিরাছ নিজে দখল করা যাইবে না। আর এই ধরনের লোকেরা বলিয়া থাকে যে, যদি ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীকে অংশ দেওয়া হয় তবে তো আমাদের জমা-জমি অন্য বংশের মধ্যে চলিয়া গেল। এই ধরনের সংকীর্ণ চিন্তা-ভাবনা কত বড় জুলুমের কথা। যাহার হক তাহাকে দিয়া দেওয়াতেই মঙ্গল। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার মোহে বিধবার হক নষ্ট করিলে পরকালে কঠিন আজাব ভোগ করিতে হইবে।

চার

আমাদের এলাকার রেওয়াজ হইল, মৃতের ত্যাজ্য সম্পদ হইতে তাহার কন্যাদেরকে অংশ দেওয়া হয় না। শুধু ছেলেরাই উহা ভোগ করে। ইহা সরাসরি

জুলুম ও হারাম। অনেকে আবার যুক্তি দেখাইয়া বলে যে, তাহারা তো উহা দাবী করে না এবং ক্ষমা চাহিলে ক্ষমা করিয়া দেয়। প্রকাশ থাকে যে, কেহ নিজের হক দাবী না করিলেই উহা দ্বারা এই কথা প্রমাণ হয় না যে, সে নিজের হক ত্যাগ করিয়াছে। আর দেশের রেওয়াজী ক্ষমার কোন শরয়ী ভিত্তি নাই। কারণ, মেয়েদের স্থির ধারণা যে, তাহারা পিতার অংশ পাইবেই না, এই কারণেই তাহারা ক্ষমা করিয়া দেয় বা নিজেদের হক দাবী করে না। যদি তাহাদের প্রাপ্য অর্থ-সম্পদ শরীয়তের বিধান মোতাবেক পৃথক করিয়া তাহাদের হাতে তুলিয়া দিয়া বলা হয় যে, "ইহা তোমাদের পিতৃপক্ষের মিরাছী সম্পদ" -উহার পরও যদি তাহারা উহা গ্রহণ না করিয়া ক্ষমা করিয়া দেয় তবে সেই ক্ষেত্রে ঐ ক্ষমা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হইবে।

অনেকেই শরীয়তের বিধানের তোয়াক্কা না করিয়া নিজেই সিদ্ধান্ত করিয়া লয় যে, ভগ্নিগণকে তাহাদের বাল-বাচ্চা সহ মাঝে মাঝে দাওয়াত করিয়া আপ্যায়ন করিব, তাহারা আসা-যাওয়া করিবে, বেড়াইবে-খেলিবে, ইহাতেই তাহাদের হক আদায় হইয়া যাইবে। এই সবই হইল ভগ্নিদের হক না দেওয়ার ফন্দি-ফিকির মাত্র। প্রথমতঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভগ্নিগণ যেই পরিমাণ মিরাছী অংশ পাইবে, তাহাদের উপর সেই পরিমাণ খরচ করা হয় না। দ্বিতীয়তঃ ভগ্নি হিসাবে যদি তাহাদিগকে আদর-আপ্যায়ন করিতে হয় তবে নিজের পয়সায় করিবে, তাহাদের পয়সা তাহাদের উপর খরচ করিয়া এই কথা দাবী করা যে, "আমি ভগ্নিদিগকে আপ্যায়ন করিয়াছি" ইহা ঠিক নহে। তৃতীয়তঃ ভগ্নিদের অংশ তাহাদের হাতে তুলিয়া না দিয়া এইভাবে তাহাদের উপর খরচ করাতে তাহারা সম্মত কি-না, এই বিষয়েও তাহাদের সঙ্গে কোন আলোচনা করা হয় না। এইভাবে এক তরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা শরীয়তসম্মত নহে।

পাঁচ

এমনিভাবে স্ত্রীদের মোহরের বেলায়ও একই হুকুম। দেশের রেওয়াজী ক্ষমা দ্বারা স্ত্রীর মোহর ক্ষমা হয় না। তবে হাঁ স্ত্রী একান্তই যদি সন্তুষ্টচিত্তে ও মনের খুশিতে নিজের মোহর ক্ষমা করিয়া দেয় তবে অবশ্যই উহা ক্ষমা হইবে। কিন্তু স্ত্রী যদি এই কথা চিন্তা করিয়া ক্ষমা করে যে, ক্ষমা করিলেই কি আর না করিলেই কি, মোহর তো আর পাওয়া যাইবে না অথবা ক্ষমা না করিয়া মোহর

দাবী করিলে দাম্পত্য সুখ নষ্ট হইবে। তবে এই ক্ষমার কোন অর্থ নাই। কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে-

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

অর্থঃ হাঁ তবে যদি স্ত্রীগণ সন্তুষ্টচিত্তে তোমাদিগকে উক্ত মোহরের কিয়দংশ ছাড়িয়া দেয়, তবে তোমরা উহা সুস্বাদু-তৃপ্তিদায়ক মনে করিয়া উপভোগ কর।

এই ক্ষেত্রেও ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিৎ যে, তাহাদের মোহর তাহাদের হাতে দিয়া দাও। অতঃপর যদি তাহারা খুশি মনে উহা ক্ষমা করিয়া দেয় তবে নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করা যাইবে।

ছয়

বিবাহ-শাদীর ক্ষেত্রেও দেখা যায়, পাত্রপক্ষ হইতে উসুলকৃত মোহরের টাকা মেয়ের পিতা বা অন্য কোন অভিভাবক নিজের নিকটই রাখিয়া দেন। নিজের নিকট আমানত হিসাবে রাখাতে কোন দোষ নাই। কিন্তু মেয়ের অনুমতি ছাড়া নিজের মনে করিয়া উহা খরচ করা, মেয়েকে কখনো ঐ টাকা না দেওয়া বা মিথ্যা ক্ষমা করাইয়া লওয়া জায়েজ নহে।

অনেকে আবার যুক্তি দেখাইয়া বলিয়া থাকেন, বিবাহের মধ্যে যেই টাকা খরচ করা হইয়াছে উহার বিনিময়ে ঐ মোহরের টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে। অথচ আজ-কাল বিবাহ-শাদীতে যেই সকল রেওয়াজী খরচ-পত্র করা হয় উহার অধিকাংশই শুধু নাম কামাইবার উদ্দেশ্যে করা হয়। তা ছাড়া এই উপলক্ষে নাচ-গান সহ এমন সব ক্রিয়া-কর্মে টাকা-পয়সা খরচ করা হয় যাহা শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নাজায়েজ। যৌতুক হিসাবেও এমন সব দ্রব্য সামগ্রী দেওয়া হয় যাহা হয়ত জীবনে কখনো কাজে লাগিবে না। জানিয়া-শুনিয়া শরীয়তের হুকুমের খেলাফ কোন কাজে অর্থ ব্যয় করা সম্পূর্ণ হারাম। আবার কন্যার অর্থ তাহার অনুমতি ছাড়া খরচ করাও হারাম। বিবাহ-শাদীতে যাবতীয় খরচ-পত্র শরীয়ত ও সুন্নত মোতাবেক হওয়াতেই সকলের জন্য মঙ্গল এবং তাহাও নিজের সম্পদ হইতেই করিতে হইবে। কন্যার অনুমতি ছাড়া তাহার মোহরের অর্থ খরচ করা সরাসরি জুলুম। কিন্তু আজ- কাল সমাজে এই অপরাধ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। যাহার অর্থ খরচ

করা হয় তাহাকে জিজ্ঞাসাও করা হয় না। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, জিজ্ঞাসা করা হইলে তাহারা নীরব থাকে, ইহাই সম্মতি। তাহাদের এই ধারণা সঠিক নহে। লেন-দেনের ব্যাপারে "নীরবতা সম্মতির বিধান" প্রযোজ্য নহে। যাহার অর্থ তাহার হস্তগত করিয়া দাও; অতঃপর যদি তাহার উপর কোন প্রকার জবরদস্তী, সামাজিকতা ও দুর্নামের ভয় না থাকে এবং সম্পূর্ণ সন্তুষ্টচিত্তে উহা দিয়া দেয় তবে সেই ক্ষেত্রে উহা গ্রহণ করিতে কোন বাঁধা নাই।

শরীয়তের বিধান মত বিবাহ হইলে তাহাতে তেমন কোন খরচ নাই। ইজাব-কবুল দ্বারাই বিবাহ সম্পন্ন হইয়া যায়। অতঃপর মেয়ে রুখছত করিয়া দিবে। পথ খরচ স্বামীই বহন করিবে। এই সকল বিষয়ে কন্যাপক্ষের জিম্মায় কোন খরচ নাই। কিন্তু বর্তমান সমাজ শরীয়তের বিধানকে উপেক্ষা করিয়া নিছক রুছম-রেওয়াজ ও নাম কামাইবার উদ্দেশ্যে বিবাহ-শাদীকে একটি ভয়াবহ আজাবে পরিণত করিয়াছে।

কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও বলিতে শোনা যায় যে, জন্মের পর হইতে আমি তাহাকে লালন-পালন করিয়াছি, সুতরাং এই সুযোগে কিছু উসুল করিয়া লইলাম। কোন কাণ্ডজ্ঞানহীন পাষণ্ড ছাড়া কেহ এই ধরনের দায়িত্বহীন উক্তি করিতে পারে না। শরীয়তের বিধান অনুযায়ী সন্তানের লালন-পালন পিতার উপর ওয়াজিব। সুতরাং আপনি স্বীয় উপার্জিত অর্থে সন্তান লালন করিয়া নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বই পালন করিয়াছেন মাত্র। এক্ষণে সুযোগ পাইয়া অবৈধভাবে উহা উসুল করিয়া লওয়া শরীয়তসম্মত নহে। তাছাড়া মানবিক দৃষ্টিতেও এই আচরণ পিতৃসুলভ নহে। সন্তানের প্রতি পিতৃস্নেহের সহজাত চেতনা ও মমত্ববোধই তাহাকে সন্তান লালন করিতে উৎসাহিত করিবে। এখানে কোন প্রকার লেন-দেন ও বেচাকেনার প্রশ্ন অমানবিক।

সাত

গৃহকর্তার নিমন্ত্রণ ছাড়া কোন দাওয়াতে যাইয়া আহার করা হালাল নহে। সৌজন্যবোধ ও ভদ্রতার খাতিরে গৃহকর্তা হয়ত তাহাকে কিছুই বলিল না, কিন্তু এই কিছু না বলাকেই তাহার পক্ষ হইতে অনুমতি মনে করা যাইবে না। কোন ঘরে চার জনকে দাওয়াত দেওয়ার পর তাহাদের সঙ্গে যদি পঞ্চম ব্যক্তিও

যাইয়া হাজির হয় তবে গৃহকর্তা ভদ্রতার খাতিরে কিছু না বলিলেও তথায় ঐ পঞ্চম ব্যক্তির আহার হারাম হইবে।

আট

অনেক সময় দেখা যায়, কোন ব্যক্তি হয়ত ঠাট্টা-কৌতুকের ছলেই অপর কাহারো কোন জিনিস লইয়া লয়। কিন্তু পরে সত্য সত্যই উহা আর ফেরৎ দেওয়া হয় না। ঐ জিনিসের মালিক ভদ্রতার খাতিরে কিছু না বলিলেও তিনি হয়ত সন্তুষ্টচিত্তে উহার দাবী ত্যাগ করেন না। সুতরাং এইভাবে কাহারো জিনিস নেওয়া হারাম।

নয়

সাধারণতঃ কাহারো ইন্তেকালের পর তাহার অর্থ হইতে খরচ করিয়া গরীব-মিসকীনকে দওয়াত করিয়া খাওয়ানো হয় এবং তাহার কাপড়-চোপড় ইত্যাদি দান করিয়া দেওয়া হয়। মৃতের ত্যাজ্য সম্পদ ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করিবার পূর্বে এইভাবে খরচ করা ঠিক নহে। ওয়ারিশদের মধ্যে অনেক নাবালেগ থাকে, আর বালেগদের মধ্যে সকলে হয়ত সেই সময় উপস্থিত থাকে না। ওয়ারিশদের যৌথ মালিকানার সম্পদ হইতে সকলের অনুমতি ছাড়া খরচ করা জায়েজ নহে। আর নাবালেগের অনুমতি এবং অন্য সকলের রেওয়াজী অনুমতির কোন মূল্য নাই। ফরায়েজ অনুযায়ী সকলের অংশ বুঝাইয়া দিবার পর ওয়ারিশগণ স্বেচ্ছায় নিজের অংশ হইতে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ইসালে ছাওয়াবের জন্য খরচ করিতে কোন বাঁধা নাই। তবে কোন নাবালেগ খুশি মনে নিজের অংশ হইতে খরচ করার অনুমতি দিলেও তাহার অনুমতি গ্রহণযোগ্য নহে।

দশ

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, ওয়ারিশগণ মৃতের করজ আদায় না করিয়াই তাহার ত্যাজ্য সম্পদ ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া লইতেছে। ইহা মাইয়্যেতের উপর অনেক বড় জুলুম। করজের দায়ে মাইয়্যেতকে আখেরাতের জবাবদিহি করিতে হইবে।

শরীয়তের বিধান হইল, মৃতের ত্যাজ্য সম্পদ হইতে প্রথমে তাহার

কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা হইবে। অতঃপর তাহার কোন করজ থাকিলে উহা পরিশোধের পর অবশিষ্ট সম্পদের এক তৃতীয়াংশ দ্বারা মৃতের কোন অসিয়ত থাকিলে উহা পূরণ করা হইবে এবং সব শেষে দুই তৃতীয়াংশ সম্পদ ওয়ারিশদের মধ্যে যথাযথভাবে বন্টন করিতে হইবে। মৃতের করজ যদি তাহার ত্যাজ্য সম্পদ হইতে বেশী অথবা বরাবর হয় তবে ওয়ারিশগণ কিছুই পাইবে না, ইহাই শরীয়তের বিধান।

কোন কোন ক্ষেত্রে মৃতের করজ আদায় করিলেও তাহার অসিয়তের উপর আমল করা হয় না। অথচ করজ আদায়ের পর অবশিষ্ট সম্পদের এক তৃতীয়াংশের উপর অসিয়ত করা তাহার ধর্মীয় অধিকার। সুতরাং তাহার অধিকার থাকিলে উহা বাস্তবায়ন করা ওয়ারিশদের উপর ওয়াজিব। তাহার অসিয়ত পূরণ করিবার পরও যদি কিছু সম্পদ অবশিষ্ট থাকে তবে উহা শরীয়তের বিধান অনুযায়ী নিজেদের মধ্যে বন্টন করিয়া লইবে।

মৃতের দাফন-কাফন ও করজ আদায়ের পর যেই সম্পদ অবশিষ্ট থাকিবে ঐ সম্পদের এক তৃতীয়াংশ দ্বারাই মৃতের অসিয়ত পূরণ করা হইবে। উহার অধিক ওয়াজিব নহে। এমনিভাবে শরীয়তের খেলাফ কোন অসিয়ত পূরণ করাও ওয়ারিশদের উপর ওয়াজিব নহে।

যদি কেহ দশ হাজার টাকা কোন মসজিদ বা মাদ্রাসায় দান করার অসিয়ত করিয়া যায় তবে তাহার দাফণ-কাফন ও করজ আদায়ের পর উদ্বৃত্ত সম্পদের এক তৃতীয়াংশের পরিমাণ যদি দশ হাজার অঙ্কের ভিতর হয় তবে অবশ্যাই তাহার অসিয়ত পূরণ করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে মৃতের অসিয়ত পূরণ না করিয়া ঐ অর্থ নিজেদের মধ্যে বন্টন করিয়া লইলে ওয়ারিশগণ গোনাহগার হইবে। পক্ষান্তরে টাকার পরিমাণ যদি দশ হাজারের কম হয় এবং বালেগ ওয়ারিশগণ যদি স্বেচ্ছায় নিজেদের অংশ হইতে উহা পূরণ করিয়া দিতে সম্মত না হয় তবে যেই পরিমাণ আছে সেই পরিমাণই মসজিদ বা মাদ্রাসায় দান করিয়া দিবে।

ফায়দা

মৃতের জিম্মায় যদি কোন করজ না থাকে তবে দাফন-কাফনের পর উদ্বৃত্ত সম্পদের এক তৃতীয়াংশ দ্বারা মরহুমের অসিয়ত পূরণ করা ওয়ারিশদের

উপর ওয়াজিব। অথচ আজ-কাল নিছক প্রথা রক্ষা ও নাম কামাইবার উদ্দেশ্যে মৃতের জন্য ইসালে ছাওয়াবের নামে ডেক-ডেকচি জড়ো করা হয়, কিন্তু মৃতের জায়েজ অসিয়ত অপূর্ণই থাকিয়া যায়। এইভাবে মৃতের হক নষ্ট করা কোন অবস্থাতেই বৈধ নহে।

অনেকের উপরই হজ্ব ফরজ হয় কিন্তু তাহারা সুস্থ জীবনে অবহেলা করিয়া হজ্ব আদায় করেন না। অতঃপর বিবিধ রোগ-ব্যাধি ও বার্ধক্যজনিত কারণে এতটা দুর্বল হইয়া পড়েন যে, তখন ইচ্ছা থাকিলেও শারীরিক কারণে হজ্বের ছফর করিতে পারেন না। অবশেষে একদিন হজ্ব না করিয়াই দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হয়। তাহাদের মধ্যে অনেকেই হজ্বের ব্যাপারে অসিয়ত করিয়া যান যে, আমার ইন্তেকালের পর আমার অর্থ দ্বারা 'বদলী হজ্ব' করাইয়া লইবে। ইন্তেকালের পর মাইয়্যেতের কোন করজ থাকিলে উহা আদায়ের পর অবশিষ্ট সম্পদের এক তৃতীয়াংশ দ্বারা মাইয়্যেতের নামে বদলী হজ্ব আদায়ের ব্যবস্থা করা ওয়ারিশদের উপর ফরজ। এই ক্ষেত্রে কোন কোন ওয়ারিশ অর্থ বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে মক্কা বা মদীনায় অবস্থানরত কোন ব্যক্তি দ্বারা সামান্য কয়েক রিয়ালের বিনিময়ে বদলী হজ্ব আদায় করাইয়া লন। এইভাবে পয়সা বাঁচাইয়া উহা নিজে ভোগ করা হারাম এবং ইহাতে মরহুমের অসিয়তও আদায় হইবে না। কারণ এইভাবে বদলী হজ্ব করানো বিধিসম্মত নহে।

পিতার সহিত সন্তানের মোহাব্বতের দাবী হইল, পিতা অসিয়ত না করিলেও তাহার ত্যাজ্য সম্পদ হইতে তাহার নামে বদলী হজ্ব আদায় করা এবং ত্যাজ্য সম্পদের এক তৃতীয়াংশ দ্বারা যদি হজ্ব সম্ভব না হয় তবে স্বেচ্ছায় নিজেদের পক্ষ হইতে উহার আয়োজন করা। পক্ষান্তরে পিতার অসিয়ত থাকা সত্ত্বেও যদি তাহার নামে হজ্ব করা না হয় তবে উহা পিতার প্রতি জুলুম ছাড়া আর কিছুই নহে।

বান্দার হকের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া সকলের জন্যই ফরজ। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ব্যাপারে অবহেলা করা হইতেছে। মানুষ খবরই রাখে না যে, দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার বিভিন্ন পর্যায়ে কোথায়, কিভাবে এবং কাহার হক নষ্ট করা হইতেছে বা উহা আদায়ের উপায়ই বা কি? উপরের সুদীর্ঘ আলোচনায় এই সকল বিষয়ে আমরা পাঠক বর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্ট করিয়াছি। আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে আমল করার তওফীক দান করুন।

একটি ভুল ধারণার অবসান

সমাজের এক শ্রেণীর লোকের ধারণা হইল, হজ্ব করিলে সকল গোনাহ্ মাফ হইয়া যায়। এই ধারণার সপক্ষে তাহারা যেই হাদীসটি পেশ করিয়া থাকে উহা হইল– নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোযদালিফায় বান্দার হক মাফ হওয়ার জন্য দোয়া করিয়াছিলেন এবং তাঁহার দোয়া কবুল হইয়াছিল। সুতরাং মানুষের হক আদায় করা জরুরী নহে (নাউযুবিল্লাহ্)। হাদীসে পাকের এই অর্থ গ্রহণ করা স্রেফ নফ্স ও শয়তানের ধোকা ছাড়া আর কিছুই নহে।

এক হাজী সাহেবের সঙ্গে আমার মাঝে মধ্যে সাক্ষাত হইত। হাজী সাহেবের অনেক বন্ধু–বান্ধব তাহার নিকট টাকা পাইত। এই প্রসঙ্গে আমি তাহাকে সতর্ক করিয়া বলিলাম, মানুষের হায়াত–মউতের কোন ঠিক–ঠিকানা নাই। বয়স হইয়াছে,কখন মৃত্যুর পরওয়ানা আসিয়া হাজির হয়; আপনি মানুষের হকসমূহ আদায় করিয়া ফেলুন। একদিন তিনি আমার কথার উত্তরে বলিলেন, মোযদালেফায় অবস্থান করিয়া দোয়া করিলে সকল হক ক্ষমা হইয়া যায়। আমি বলিলাম, আপনি হাদীসের অর্থ ভুল বুঝিয়াছেন। হাদীসের অর্থ এই নহে যে,হজ্ব করিলেই বান্দার সকল হক ক্ষমা হইয়া যায়। যদি এইরূপই হইত তবে ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)–গণ বিশেষতঃ ঐ সকল ছাহাবাগণ যাহারা স্বয়ং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হজ্ব আদায় করিয়াছেন তাহারা আর মানুষের হক আদায়ের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করিতেন না। কিন্তু ছাহাবায়ে কেরামগণ হাদীসে পাকের এই অর্থ করেন নাই যে, জানিয়া–শুনিয়া মানুষের হক নষ্ট করিবার পর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও উহার ক্ষতিপূরণ কিংবা ক্ষমা চাহিয়া দায়মুক্ত হওয়ার প্রয়োজন নাই। ছাহাবায়ে কেরামগণের পরবর্তী যুগ হইতে শুরু করিয়া আজ পর্যন্ত কোন মোহাদ্দেস, ইমাম, মোজতাহিদ এবং কোন মাজহাবের কোন ফকীহ বা মূফতী এই কথা বলেন নাই যে, বান্দার হক ও জুলুম হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য মৃত্যুর পূর্বে একবার হজ্ব করিয়া লইলেই চলিবে। অতঃপর আর উহার ক্ষতিপূরণ, করজ পরিশোধ কিংবা ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজন হইবে না। যদি কোন জাহেল হাদীসের এই অর্থ বুঝিয়া থাকে যে, আজীবন বান্দার হক তথা জুলুম–অত্যাচার ও

আত্মসাৎ করিয়া মৃত্যুর পূর্বে একবার হজ্ব করিয়া লইলেই সকল কিছু পাক–ছাফ হইয়া যাইবে; তবে সে মারাত্মক ভুল করিতেছে। এমন বিধান থাকিলে তো প্রতি বছর মানুষ চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, খেয়ানত, ধার–করজ ইত্যাদি উপায়ে লক্ষ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া বছর শেষে লাখ খানেক টাকা খরচ করিয়া আখেরাতের আজাব হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ হইয়া যাইবে। অর্থাৎ উপরোক্ত হাদীসের উছিলায় বিনা শ্রমে বছরে হাজার হাজার টাকা মুনাফা করা যাইবে এবং পরকালের জবাবদিহির ব্যাপারেও কোন দুশ্চিন্তা করিতে হইবে না। এই হইল শয়তানের কাজ। দুনিয়াতে মানুষ যে যেই লাইনে থাকে শয়তান তাহাকে সেই লাইনেই ধোঁকা দেয়। যেই ব্যক্তি ধন–সম্পদ ও ভোগ–বিলাসে আগ্রহী তাহাকে সেই পথে রাখিয়াই ধোকা দেয়, যাহারা শরীয়তের হুকুম–আহকাম মানিয়া চলিতে চায় তাহাদিগকে সরাসরি আল্লাহ্র নাফরমানীর কথা না বলিয়া বরং কোরআন হাদীসের অপব্যাখ্যা বুঝাইয়া দ্বীনের ছুরতেই বিপথগামী করে।

যেই হাদীসটিকে কেন্দ্র করিয়া উপরোক্ত অপব্যাখ্যা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হইয়াছে সেই হাদীসটি হইল; নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতে আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া করিলেন, হে আমার রব! যদি আপনি ইচ্ছা করেন তবে মজলুমকে জান্নাত দান করুন এবং জালেমকে ক্ষমা করিয়া দিন। এই দোয়া আরাফাতে কবুল হয় নাই। অতঃপর সকালে মোযদালেফায় যখন পুনরায় সেই দোয়া করিলেন তখন উহা কবুল হইল।

ছুনানে ইবনে মাজাতে হাদীসটি এইভাবে উল্লেখ আছে–

قَالَ اَیْ رَبِّ اِنْ شِئْتَ اَعْطَیْتَ الْمَظْلُوْمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَغَفَرْتَ لِلظَّالِمِ فَلَمْ یُجَبْ عَشِیَّتَهٗ فَلَمَّا اَصْبَحَ بِالْمُزْدَلِفَةِ اَعَادَ الدُّعَاءَ فَاُجِیْبَ اِلٰی مَا سَأَلَ ط

হাদীসের অর্থ আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে কোথাও এই কথা বলা হয় নাই যে, যেই ব্যক্তি হজ্ব করিবে তাহার জিম্মায় মানুষের যত হক আছে, যত জুলুম ও করজ করিয়াছে– অর্থাৎ যাবতীয় হক্কুল এবাদ ঐ এক হজ্ব দ্বারাই ক্ষমা হইয়া যাইবে এবং আখেরাতে এই বিষয়ে তাহাকে কোন প্রকার

জবাবদিহি করিতে হইবে না।

হাদীসে পাকে শুধু এই কথা বলা হইয়াছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ পাকের নিকট দোয়া করিয়াছেন যে, আল্লাহ্ পাক যদি ইচ্ছা করেন তবে নিজের পক্ষ হইতে মজলুমকে জান্নাত দিয়া দিবেন এবং জালেমকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। অর্থাৎ ইহাও আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে এই অনুগ্রহ করিবেন, ইচ্ছা না হইলে করিবেন না।

কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ

অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমা করিবেন না তাঁহার সহিত শরীক স্থির করাকে এবং এতদ্ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় পাপ যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিয়া দিবেন।

হাদীসে এমন বলা হয় নাই যে, আল্লাহ্ পাক মজলুমকে নিজের পক্ষ হইতে যাবতীয় হক দান করিয়া জালেমকে অবশ্যই ক্ষমা করিয়া দিবেন। আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছার উপরই সব কিছু নির্ভরশীল। তিনি ইচ্ছা করিলে ক্ষমা করিবেন, ইচ্ছা না করিলে ক্ষমা করিবেন না। সুতরাং এই গ্যারান্টি কোথা হইতে পাওয়া গেল যে, একবার হজ্ব করিলেই মানুষের হক, করজ, জুলুম ইত্যাদি নির্ভাবনায় ক্ষমা হইয়া যাইবে? আসলে হাদীস বিষয়ে যাহারা বিশেষ পারদর্শী তাহারাই উহার অর্থ ও মর্ম উপলব্ধি করিতে পারেন। উহা সকলের কাজ নহে। তদুপরি হাদীসের সনদও দেখিতে হইবে। আলোচ্য হাদীসের বর্ণনাকারী হইলেন, আব্দুল্লাহ্ বিন কেনান। তাহার সম্পর্কে ছুনানে ইবনে মাজার টীকাকার আল্লামা ইবনে সিন্ধি (রহঃ) জাওয়ায়েদে ইবনে মাজা হইতে নকল করেন, হযরত ইমাম বোখারী (রঃ) বলিয়াছেন যে, তাহার বর্ণিত হাদীস বিশুদ্ধ নহে। হাফেজ ইবনে জাওযী আব্দুল্লাহ্ বিন কেনানার পিতা কেনানা সম্পর্কে মন্তব্য বরিয়াছেন, তাহার হাদীস প্রত্যাখ্যাত। আর কেনানার কারণেই তিনি ঐ হাদীসকে 'মওজু' বা জাল হাদীসের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। হাদীসটি মওজু না হইলেও উহার সনদ দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই।

উপরোক্ত হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে এতসব সংশয় সন্দেহ ও দুর্বলতা

থাকা সত্ত্বেও উহারই ভিত্তিতে "মানুষের হক নষ্ট করিয়া একবার হজ্ব করিলেই সকল অপরাধ ক্ষমা হইয়া যাইবে" এমন বিশ্বাস করা নিছক অজ্ঞতা ও শয়তানের ধোকা ছাড়া আর কিছুই নহে। আর হাদীসের ভাণ্ডারে কি ঐ একটি হাদীসই আছে, যেই হাদীসকে মোহাদ্দেসীনগণ 'মওজু' ও 'জইফ' বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন? উহার পাশাপাশি মানুষের হক আদায়ের ব্যাপারে বর্ণিত অসংখ্য হাদীসের প্রতি কেন নজর দেওয়া হইতেছে না? মানুষের গীবত করা, অপবাদ দেওয়া, সম্ভ্রমহানী করা, করজ আদায়ের ব্যাবস্থা না করিয়াই মৃত্যুবরণ করা– অর্থাৎ যে কোনভাবেই মানুষের উপর জুলুম করার ব্যাপারে বিশুদ্ধ হাদীস সমূহে যেই সকল সতর্কবাণী আসিয়াছে উহার প্রতি ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা করিলে আখেরাতে কোন ক্রমেই মুক্তি পাওয়া যাইবে না। এতদ্‌বিষয়ে আমার লিখিত "হালাল উপার্জন ও মানুষের হক আদায়" শীর্ষক গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

মুরীদের কর্তব্য

অনেক মুরীদকেই জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারে না যে, সে কি উদ্দেশ্যে মুরীদ হইয়াছে। সমাজের সর্বত্র আজ হুজুগের এতই দাপট যে, পীর–মুরীদীও উহা হইতে রক্ষা পায় নাই। এখানেও মানুষ সকলের দেখাদেখি পীর ধরিতেছে। কি কারণে ও কি উদ্দেশ্যে মুরীদ হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে কিছুই বলিতে পারে না। সে শুধু এতটুকুই বলিতে পারে যে, অমুক তরীকায় মুরীদ হইয়াছি। আরেক শ্রেণীর মুরীদের ধারণা হইল, পীর ছাহেব কেয়ামতের দিন তাহাদের জন্য সুপারিশ করিবেন, এই উদ্দেশ্যেই তাহারা পীরের হাতে বাইয়াত হয়। যেই পীর নিজেই শরীয়তের উপর আমল করে না, সে অপরের জন্য কি সুপারিশ করিবে?

পীরের হাতে বাইয়াত হওয়ার সময় যেই তওবা করা হয় উহা কবুল হওয়ার জন্য তওবার শর্তসমূহ এবং উহার আনুসঙ্গিক বিষয়াদির উপর আমল করা জরুরী। তওবার যাবতীয় শর্তসমূহ পিছনে আলোচনা করা হইয়াছে। মুরীদ হওয়ার পরও যদি শরীয়তের হুকুম মানিয়া না চলে, এবং যাবতীয় গোনাহ হইতে যেমন, হালাল–হারামের পরোয়া না করা, অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন করা, নাজায়েজ কাজে অর্থ খরচ করা, মানুষের হক নষ্ট করা, আত্মসাৎ করা

ইত্যাদি পাপাচার হইতে নিজেকে হেফাজত করা না হয় তবে মনে করিতে হইবে যে, সেই মুরীদ খাঁটি অন্তরে তওবা করে নাই অথবা পীর সাহেব নিজেই একজন খাঁটি দুনিয়াদার। "গদীনশীন পীর" নামে খ্যাত এক শ্রেণীর মুর্খ পীর যাহারা বাপ-দাদার গদীর হাল ধরিয়া মিরাছ সুত্রে পীর হইয়াছেন তাহারা ঐ পীরালীকে নিছক অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছেন। শরীয়ত ও আখেরাত সম্পর্কে তাহাদের সুস্পষ্ট কোন ধারণা নাই। এই শ্রেণীর পীরের হাতে বাইয়াত হইবার পর আখেরাতের চিন্তা ও ফিকির সৃষ্টি হওয়ার পরিবর্তে দুনিয়ার মোহাব্বতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। হক্কুল্লাহ্ ও হক্কুল এবাদ আদায়ের ব্যাপারেও তাহাদের অন্তরে কোন ফিকির পয়দা হয় না।

ভাই সকল! মুরীদ হওয়ার পূর্বে এমন হক্কানী পীর তালাশ করিতে হইবে যিনি শরীয়তের পরিপূর্ণ অনুসারী, দুনিয়ার প্রতি একেবারেই নিরুৎসাহী, আল্লাহ্‌র নাফরমানী ও পাপ যাহাকে স্পর্শ করে না এবং যাহার স্পর্শে আসিলে আখেরাতের ফিকির বৃদ্ধি পাইয়া পাপের প্রতি সৃষ্টি হয় ঘৃণা। যেই পীরের ছোহবতে আসিলে নেক আমলের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, হারাম কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকিয়া বান্দার হক আদায়ের প্রতি মনোযোগ এবং শরীয়তের বিধান মানিয়া চলার আগ্রহ সৃষ্টি হয় তিনিই হক্কানী পীর। পক্ষান্তরে যদি কোন পীর মানুষকে মুরীদ করে বটে কিন্তু নিজে শরীয়তের আহকাম ও বান্দার হকের প্রতি কোন খেয়াল না করে অর্থাৎ ব্যক্তি জীবনে সে আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী হইতে পবিত্র না হয়, তবে সে মানুষকে মুরীদ করার উপযুক্ত নহে। এমন পীর হইতে দূরে থাকা ওয়াজিব

তৃতীয় অধ্যায়

এই অধ্যায়ে তওবার ফাজায়েল এবং উহার দ্বীনী ও দুনিয়াবী উপকারিতা ও বিশেষ বিশেষ মুহূর্তের বিবরণ পেশ করা হইয়াছে।

পূর্ব কথা

তওবা অর্থ আল্লাহ্ পাকের দিকে রুজু হওয়া আর এস্তেগফার অর্থ ক্ষমা প্রার্থনা করা। অতীতের গোনাহ্-খাতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য মনে মনে লজ্জিত হওয়া এবং ভবিষ্যতে যাবতীয় পাপ হইতে বাঁচিয়া থাকিবার দৃঢ় অঙ্গীকার করা। ইহাই তওবার মূল কথা। আর আত্মসংশোধনের উপায় অবলম্বন এবং হক্কুল্লাহ ও হক্কুল এবাদ আদায় করা ইত্যাদি হইল তওবার আনুসঙ্গিক উপাদান। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

হাদীসে পাকের বিবরণে জানা গিয়াছে যে, বেশী বেশী এস্তেগফার করা আল্লাহ্ পাকের নিকট অনেক পছন্দনীয়। তওবা দ্বারা গোনাহ্ ক্ষমা হওয়া ছাড়াও দ্বীনি ও দুনিয়াবী অনেক ফায়দা রহিয়াছে। হুজুরে কলবী ও মনের একাগ্রতা ছাড়া অবচেতন মনে শুধু মুখে মুখে এস্তেগফার করিলেও উহা ফায়দা হইতে খালি নহে। বেশী বেশী এস্তেগফার করিলে এক দিকে আল্লাহ্ পাকের জিকির এবং অপর দিকে এস্তেগফার- এই উভয় ফায়দা পাওয়া যাইবে।

এস্তেগফার করা

হাদীস-২০

وَعَنْ أُمِّ عِصْمَةَ الْعَوْصِيَّةِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعْمَلُ ذَنْبًا اِلَّا وَقَفَ الْمَلَكُ ثَلٰثَ سَاعَاتٍ فَاِنِ اسْتَغْفَرَ مِنْ ذَنْبِهٖ لَمْ يَكْتُبْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُعَذِّبْهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থঃ হযরত উম্মে ইসমাতা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন কোন মুসলমান গোনাহ্ করে তখন (গোনাহ্ লেখার কাজে নিয়োজিত) ফেরেস্তা কিছু সময় অপেক্ষা করে, এই সময় যদি এস্তেগফার করা হয় তবে

ঐ গোনাহ্ তার আমলনামায় আর লেখা হয় না এবং ঐ গোনাহের কারণে কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক তাহাকে আজাব দিবেন না।

– মুসতাদরাকে হাকিম

ব্যাখ্যা– উক্ত হাদীসে আল্লাহ্ পাকের অসীম রহমতের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। যখন কোন মুসলমান গোনাহ্ করে তখন উহা লিপিবদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত ফেরেস্তা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া দেখে যে, সে তওবা করে কি–না যদি সে তওবা করে তবে ফেরেস্তা তাহার ঐ গোনাহ্ লিপিবদ্ধ করে না। সুতরাং কেয়ামতের দিন ঐ গোনাহ্ পেশ করা হইবে না। এবং শাস্তিও দেওয়া হইবে না। আল্লাহ্ পাকের কত বড় মেহেরবানী যে একটি নেক আমল করা হইলে উহা দশগুন বৃদ্ধি করিয়া দশটি নেকী লেখা হয় আর একটি বদ আমল করিলে মাত্র একটি গোনাহ্ লেখা হয়। তাহাও আবার বদ আমল করার সঙ্গে সঙ্গেই লেখা হয় না। বান্দার এস্তেগফারের জন্য অপেক্ষা করা হয়। যদি এস্তেগফার করা হয় তবে ঐ গোনাহ্ আদৌ লেখা হয় না। এমনিভাবে ছগীরা গোনাহ্সমূহ নেক আমলের বিনিময়ে ক্ষমা করিযা দেওয়া হয়। আর কবীরা গোনাহ্ হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য আল্লাহ্ পাকের তওবার দরজা সকল সময়ই খোলা আছে। আল্লাহ্ পাক বড় দয়ালু ও ক্ষমাকারী। তাহার রহমত ও দয়ার কথা জানিবার পরও তওবা না করিয়া মৃত্যুবরণ করা বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা।

আমলনামায় এস্তেগফার

হাদীস–২১

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ بُسْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُوْبٰى لِمَنْ وَجَدَ فِىْ صَحِيْفَتِهٖ اِسْتِغْفَارًا كَثِيْرًا ـ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন বুছরি রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ ব্যক্তির অবস্থা অনেক উত্তম, যে কেয়ামতের দিন নিজের আমলনামায় প্রচুর এস্তেগফার পাইবে। – ইবনে মাজা।

ব্যাখ্যাঃ এই হাদীসে বেশী বেশী এস্তেগফার করার জন্য উৎসাহিত করা হইয়াছে এবং যেই ব্যক্তি কেয়ামতের দিন নিজের আমলনামায় অধিক সংখ্যায় এস্তেগফার পাইবে তাহার উত্তম পরিণতির সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে। বেশী বেশী এস্তেগফার করিলে নেক আমলে নিরুৎসাহ ও দুর্বলতা দূর হইয়া তদস্থলে আগ্রহ ও উৎসাহ সৃষ্টি হয় এবং গোনাহ্খাতা ক্ষমা হয়। সুতরাং এস্তেগফার দ্বারা উত্তম পরিণতি হওয়াই স্বাভাবিক। আর প্রকাশ থাকে যে, যেই ব্যক্তি দুনিয়াতে বেশী বেশী এস্তেগফার করিবে সেই ব্যক্তিই কেয়ামতের দিন তাহার আমলনামায় বেশী বেশী এস্তেগফার দেখিতে পাইবে।

আমলনামার শুরু ও শেষে এস্তেগফার

হাদীস–২২

وَعَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ حَافِظَيْنِ يَرْفَعَانِ اِلَى اللّٰهِ فِىْ يَوْمٍ فَيَرٰى تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فِىْ اَوَّلِ الصَّحِيْفَةِ اِسْتِغْفَارًا وَفِىْ اٰخِرِهَا اِسْتِغْفَارًا اِلَّا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ مَا بَيْنَ طَرَفَىِ الصَّحِيْفَةِ

অর্থঃ হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের আমলনামা লেখায় নিয়োজিত দুই ফেরেস্তা যখন কোন বান্দার আমলনামা পেশ করে আর ঐ আমলনামার শুরু ও শেষে এস্তেগফার থাকে তখন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন, আমি আমার বান্দার আমলনামার শুরু ও শেষের মধ্যবর্তী বিষয়সমূহ ক্ষমা করিয়া দিয়াছি। – বাজ্জার

ব্যাখ্যাঃ মানুষের পাপ–পূণ্য লেখায় নিয়োজিত ফেরেস্তাদ্বয় ফজর ও আছরের সময় তাহাদের কর্মকাল পরিবর্তন করে। ফজরের সময় রাতের ফেরেস্তা চলিয়া যায় এবং দিনের ফেরেস্তা আগমন করে। এমনিভাবে আছরের সময় দিনের ফেরেস্তা চলিয়া যায় এবং রাতের ফেরেস্তা আগমন করে। ফেরেস্তাগণ যখন আল্লাহ্ পাকের দরবারে বান্দাদের আমলনামা পেশ করে তখন যেই সকল

বান্দার আমলনামার শুরু ও শেষে এস্তেগফার থাকে আল্লাহ্ পাকের এরশাদ অনুযায়ী তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়, যদিও ঐ আমলনামার মধ্যবর্তী স্থলে গোনাহ্ থাকে। ইহা আল্লাহ্ পাকের কত বড় এহ্সান যে, আমলনামার শুরু ও শেষের এস্তেগফারের উছিলায় মাঝখানের সকল গোনাহ্ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। আর যাহারা সকাল সন্ধ্যায় এস্তেগফার করিয়া থাকে তাহাদের আমলনামার শুরু ও শেষে এস্তেগফার লেখা হয়।

এস্তেগফারের সুফল

হাদীস—২৩

وَعَنْ اَبِى بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وَاِنْ عَادَ فِى الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً

অর্থঃ হযরত আবু বকর ছিদ্দীক রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি এস্তেগফার করিতে থাকে সে ঐ ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হইবে না যাহার বারংবার গোনাহ্ করে; যদিও সে একদিনে সত্তরবার গোনাহ্ করে।

– তিরমিজী, আবু দাউদ।

ব্যাখ্যাঃ বস্তুতঃ পাপ ও গোনাহ্ হইল মানুষের জন্য অভিশাপ ও আজাবের কারণ। আর একই পাপ বার বার করা যেন আল্লাহ্র সঙ্গে বিদ্রোহেরই নামান্তর। এই কারণেই ওলামায়ে কেরামগণ লিখিয়াছেন, কোন ছগীরা গোনাহ্ যখন বার বার করা হয় তখন উহাও কবীরা গোনাহে্ পরিণত হইয়া যায়। কিন্তু যেই ব্যক্তি নিয়মিত তওবার ছেলছেলা জারী রাখে সে বারংবার গোনাহ্কারী বলিয়া গণ্য হয় না। উপরোক্ত হাদীসে এই বিষয়টির প্রতিই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। এখানে অপর যেই বিষয়টি বিবৃত হইয়াছে তাহা হইল— স্বীয় অপরাধের উপর বার বার লজ্জিত হইয়া এস্তেগফার করিতে থাকিলে ক্রমে গোনাহের অভ্যাসও ছুটিয়া যাইবে। কারণ, বার বার এস্তেগফারের পর গোনাহের পুনরাবৃত্তি করিতে নিজের কাছেও লজ্জাবোধ হইতে থাকিবে। আর

বান্দা যখন এস্তেগফার করিতে থাকিবে তখন আল্লাহ্ পাকও তাহাকে সাহায্য করিবেন।

আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করিতে থাকিব

হাদীস—২৪

وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ لَا اَبْرَحُ اُغْوِىْ عِبَادَكَ مَادَامَتْ اَرْوَاحُهُمْ فِىْ اَجْسَادِهِمْ فَقَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِىْ وَجَلَالِىْ وَارْتِفَاعِ مَكَانِىْ لَا اَزَالُ اَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُوْنِىْ

অর্থঃ আবু ছাঈদ খুদরী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিশ্চয়ই শয়তান বলিয়াছে যে, হে রব! তোমার ইজ্জতের কসম! তোমার বান্দাদের দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকিবে আমি তাহাদিগকে প্রতারিত করিতেই থাকিব। উত্তরে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করিলেন, আমার ইজ্জত–সম্মান ও উচ্চ মর্যাদার কসম! বান্দা যতক্ষণ আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকিবে আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে থাকিব।

ব্যাখ্যাঃ শয়তান মানুষের অনেক বড় শত্রু। সে সর্বদা মানুষকে বিপথগামী করিয়া দোজখে নিক্ষেপের ফিকিরে লাগিয়াই আছে। যখন আল্লাহ্ পাক তাহাকে দরবার হইতে বহিষ্কার করিয়া 'মালাউন' (অভিশপ্ত) আখ্যা দিলেন তখন সে কেয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকার সুযোগ প্রার্থনা করিল। তাহার প্রার্থনা কবুল করিবার পর সে বলিল, আমি আদম সন্তানকে সত্যের পথ হইতে প্রতারিত করিয়া বিপথগামী করিব। শয়তান তাহার কথা রক্ষা করিয়াছে। তাহার অসংখ্য অনুচর দ্বারা আদম সন্তানকে ধোঁকা দিয়া বিপথগামী করিতেছে। শয়তান কখনো তাহার নিজের কাজে অবহেলা করিতেছে না। কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয় এই যে, মানুষ নিজের নির্বুদ্ধিতার কারণে চিরশত্রু শয়তানের ফাঁদে পড়িয়া আল্লাহ্র নাফরমানীতে লিপ্ত হইতেছে।

শয়তান যখন আল্লাহ্ পাকের দরবারে আরজ করিল যে, মানুষের দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকিবে ততক্ষণ আমি তাহাদিগকে ধোঁকা দিতেই থাকিব; তখন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করিলেন, আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে থাকিব যতক্ষণ তাহারা এস্তেগফার করিতে থাকিবে।

শয়তান প্রথমতঃ মানুষকে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনিতেই বাঁধা প্রদান করে। সে চায় মানুষ যেন কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিয়া চির জাহান্নামী হয়। আর মুসলমানদিগকেও কুফরীতে লিপ্ত হইতে ধোকা দিতে থাকে। যদি উহা সম্ভব না হয় তবে অন্ততঃ ছগীরা ও কবীরা গোনাহে অবশ্যই লিপ্ত করাইয়া ছাড়ে। সুতরাং মানুষের করণীয় হইল, নিজের লাভ লোকসানের কথা চিন্তা করিয়া চিরশত্রু শয়তানের ধোকায় কর্ণপাত না করা। যদি কখনো কোন অপরাধ হইযা যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে তওবা করা, যেন শয়তান গোনাহ্গারের ক্ষমাপ্রাপ্তি দেখিয়া অপমানিত হইয়া জ্বলিতে থাকে।

আত্মশুদ্ধির জন্য এস্তেগফার

হাদীস—২৫

وَعَنِ الْاَغَرِّ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهٗ لَيُغَانُ عَلٰى قَلْبِىْ وَاِنِّىْ لَاَسْتَغْفِرُ
اللّٰهَ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ

অর্থঃ হযরত আগার আল মাজানী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে আমার অন্তরেও কলুষতা আসিয়া পড়ে এবং নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহ্ পাকের দরবারে দৈনিক একশত বার অবশ্যই তওবা করি। – মুসলিম

ব্যাখ্যাঃ হক্কানী ওলামা ও আরেফীনগণ উপরোক্ত হাদীসে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি "আমার অন্তরেও কলূষতা আসিয়া পড়ে" এর বিভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। উহার একটি হইল জেহাদের তদারক এবং উম্মতের কল্যাণ ও ভালাই'র প্রতি দৃষ্টিদানের কারণে আল্লাহ্ পাকের উপর হইতে দিলের তাওয়াজ্জহ' তে যেই সামান্য ব্যবধান ও দূরত্ব সৃষ্টি হইত

উহাকেই নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'কলুষতা' দ্বারা ব্যাখা করিয়াছেন। জেহাদের এন্তেজাম, যুদ্ধ পরিচালনা এবং উম্মতের ভালাই'র প্রতি দৃষ্টি দান করা, ইহাও বড় এবাদত বটে। কিন্তু এই সকল বিষয়ে আত্মনিয়োগ করার কারণে একাগ্রতার সহিত আল্লাহ্ পাকের স্মরণের মধ্যে যেই সামান্য বিঘ্ন সৃষ্টি হইল– উহাকেই নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ পাকের জাত বহির্ভূত অপর বস্তুর 'কলুষতা' বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। উহাকে দূর করার জন্যই তিনি এস্তেগফার করিতেন।

রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিজের সম্পর্কে এরশাদ করিতেছেন যে, আমার অন্তরে কলুষতা আসিয়া পড়ে এবং আমি উহাকে এস্তেগফার দ্বারা ধৌত করিয়া পরিষ্কার করি, তখন আমাদের নিজেদের এস্তেগফারের ব্যাপারে কতটুকু যত্নবান হওয়া উচিত? আমরা তো সদা–সর্বদা গোনাহের সমূদ্রে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। সুতরাং নিয়মিত তওবা ও এস্তেগফারে নিমগ্ন থাকা আমাদের জন্য নেহায়েত জরুরী।

হাদীস—২৬

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا اَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ
سَوْدَاءُ فِىْ قَلْبِهٖ فَاِنْ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهٗ وَاِنْ زَادَ زَادَتْ
حَتّٰى تَعْلُوَا قَلْبَهٗ فَذٰلِكُمُ الرَّانُ الَّذِىْ ذَكَرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى : كَلَّا
بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে মোমেন বান্দা যখন গোনাহ্ করে তখন তাহার অন্তরে একটি কালো দাগ সৃষ্টি হয়। অতঃপর যদি সে তওবা ও এস্তেগফার করিয়া লয় তবে তাহার অন্তর পরিষ্কার হইয়া যায়। পক্ষান্তরে যদি সে তওবা না করিয়া গোনাহের মধ্যেই লিপ্ত থাকে তবে তাহার অন্তরের কালো দাগও বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। এমনকি অন্তরের উপর উহার প্রাধান্য সৃষ্টি হইয়া যায়। অন্তরের এই

কালো দাগ সম্পর্কেই কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ -

–না, কখনো এইরূপ নহে, বরং তাহাদের অন্তরসমূহ তাহাদের (গর্হিত) কার্যকলাপের মরিচা ধরিয়াছে। – আহমদ, তিরমিজী, ইবনে মাজা

ব্যাখ্যাঃ হযরত আগার মাজানী রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস দ্বারা জানা যায়, গায়রুল্লাহ্‌র প্রতি মন নিবিষ্ট হওয়ার কারণে মনের মধ্যে কলুষতা সৃষ্টি হয়। আর হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহুর রেওয়ায়েত দ্বারা জানা গেল যে, পাপের কারণে অন্তরে মরিচা পয়দা হয়। দিলের কলুষতা ও মরিচা দূর করার জন্য নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এস্তেগফারের কথা বলিয়াছেন। এস্তেগফারই হইল অন্তরকে কলুষমুক্ত করার একমাত্র চিকিৎসা। সর্বাবস্থায় অন্তরকে পাপের কালিমা হইতে পরিচ্ছন্ন রাখা জরুরী। সুতরাং যদি কখনো কোন গোনাহ্ হইয়া যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে তওবা করিয়া লওয়া আবশ্যক। যাহারা তওবা ও এস্তেগফার করে না, গোনাহ্ করিতে করিতে তাহাদের অন্তরের পতন ঘটে। অতঃপর অন্তরে আর পাপের অনুভূতিও থাকে না। মানবাত্মার এই বিপর্যয় চরম দুর্ভাগ্যের আলামত।

মানুষের সঙ্গে বেশী মিলামিশা ও গল্প গুজবে মাতিয়া থাকা, বিশেষতঃ ফাসেক, ফাজের ও গোনাহ্গারদের সঙ্গে বেশী উঠা বসা করাই আত্মার পবিত্রতা বিনষ্টের অন্যতম কারণ। তাই সাধারণ মানুষের আড্ডা ও সমাবেশ হইতে দূরে থাকা ভাল।

ছফরের হালাতে বা অন্য কোন কারণে যদি একান্তই মানুষের সঙ্গে বসিতে হয় তবে এস্তেগফারে মশগুল থাকিবে। এবং কথাবার্তা ও আলোচনা হইতে ফারেগ হওয়ার পরও এস্তেগফার জারী রাখিবে যেন দিলের উপর পতিত যাবতীয় বদ আছর দূরীভূত হইয়া যায়।

আমলের পরিশুদ্ধির জন্য এস্তেগফার

হাদীস–২৭

وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ كُنْتُ ذَابَ اللِّسَانِ عَلٰى اَهْلِىْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَدْ خَشِيْتُ اَنْ يُّدْخِلَ لِسَانِىْ النَّارَ قَالَ: اَيْنَ اَنْتَ مِنَ الاِسْتِغْفَارِ؟ اِنِّىْ لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ فِىْ الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ

অর্থঃ হযরত আবু হোযায়ফা রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আমার ঘরের লোকদের সঙ্গে অকথ্য ভাষায় কথা বলিতাম। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, আমার জবান আমাকে দোজখে প্রবেশ করাইয়া না দেয়। তিনি এরশাদ করিলেন, তুমি এস্তেগফার হইতে দূরে থাক কেন? আমি আল্লাহ্ পাকের দরবারে দৈনিক একশতবার এস্তেগফার করি।

– মুসতাদরিকে হাকিম।

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদীসে জবানের এছলাহ্ ও সংশোধনের জন্য নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এস্তেগফার করিতে আদেশ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা জানা গেল যে, এস্তেগফারের বহুবিধ উপকারিতার মধ্যে ইহাও একটি যে, উহা দ্বারা মানুষের আমল সংশোধন হয় এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গসমূহ সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়।

হাদীস–২৮

وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلٰوتِهٖ اسْتَغْفَرَ ثَلٰثًا وَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ -

অর্থঃ হযরত ছাওবান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে,

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ হইতে ফারেগ হইয়া তিনবার এস্তেগফার হিসাবে এই দোয়া পড়িতেন–

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

– মুসলিম

হাদীস–২৯

عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ نِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! عَلِّمْنِىْ دُعَاءً اَدْعُوْ بِهٖ فِىْ صَلٰوتِىْ قَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

হযরত আবু বকর ছিদ্দীক রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে এমন কোন দোয়া বলিয়া দিন যাহা আমি নামাজের মধ্যে প্রার্থনা করিব। এরশাদ হইল, তুমি এইরূপ বল– .

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ -

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! আমি আমার প্রবৃত্তির উপর অনেক জুলুম করিয়াছি, আর গোনাহ্সমূহকে কেবল তুমিই ক্ষমা করিতে পার। সুতরাং তুমি স্বীয় মাগফেরাত দ্বারা আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও এবং আমার উপর রহম কর। নিশ্চয় তুমিই মেহেরবান ও ক্ষমাকারী

ব্যাখ্যাঃ হযরত ছাওবান রাজিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণিত হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের ছালাম ফিরাইয়া তিনবার এস্তেগফার করিতেন। দৃশ্যতঃ এখানে এস্তেগফার করার কোন কারণ দেখা যায় না। ক্ষমা চাওয়ার মত কোন অপরাধও করা হয় নাই। নামাজ আদায়ের পর এস্তেগফার করা হইতেছে। আর এই নামাজও সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সত্তা সাইয়্যেদুর্‌রুসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদায় করিয়াছেন। যেই নামাজের খুশু–খুজু, এখলাস ও আন্তরিকতার মধ্যে কাহারো কোন সন্দেহ নাই।

অপর হাদীস হইতে জানা গেল যে, হযরত ছিদ্দীকে আকবার রাজিয়াল্লাহু আনহু যখন নামাজের মধ্যে পাঠ করার জন্য কোন দোয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন ছরওয়ারে আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে একটি দোয়া বলিয়া দিলেন। এই প্রসিদ্ধ দোয়াটি সম্পর্কে প্রায় সকলেই অবগত। অধিকাংশ নামাজের কিতাবে দোয়াটি উল্লেখ আছে। নামাজীগণ ইহাকে আত্তাহিয়্যাতু ও দুরূদের পর পাঠ করিয়া থাকেন। এই দোয়াটির মাধ্যমে নামাজের ভিতর অর্থাৎ নামাজ শেষ হইবার পূর্বক্ষণে মাগফেরাত কামনা করার তালীম দেওয়া হইয়াছে। দোয়ার শুরুতেই বলা হইয়াছে " হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার নফসের উপর অনেক জুলুম করিয়াছি।" কি আশ্চর্যের বিষয়! পড়া হইল নামাজ, আর তাহাও পড়িলেন স্বয়ং হযরত আবু বকর ছিদ্দীক রাজিয়াল্লাহু আনহু, অথচ নামাজের পর তিনি বলিতেছেন, আমি নিজের নফসের উপর জুলুম করিয়াছি। ইহার রহস্য কি? আসল ব্যাপার হইল আল্লাহ্ পাকের দরবার অনেক বড়। তাঁহার শান অনুযায়ী এবাদত করা বান্দার পক্ষে সম্ভব নহে। সুতরাং এবাদতের মধ্যে যাহা কিছু ত্রুটি হয়, এস্তেগফার দ্বারা উহার তালাফী বা ক্ষতিপূরণ হইয়া যায়। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও নামাজের পর এস্তেগফার করিতেন। পবিত্র কোরআনে হজ্জের সময় আরাফাত হইতে প্রত্যাবর্তনের পরও এস্তেগফার করিতে আদেশ করা হইয়াছে। এক্ষেত্রেও হজ্জের যাবতীয় ত্রুটির তালাফী হিসাবে এস্তেগফার করিতে বলা হইয়াছে।

আসলে আল্লাহ্ পাকের রেজামন্দি হাসিলের পদ্ধতিই হইল এবাদত করিতে থাকা এবং সঙ্গে সঙ্গে এস্তেগফার করিতে থাকা। ছালেহীন ও আল্লাহ্ওয়ালাগণ ঠিক ঐ তরীকায় এবাদত–বন্দেগী করেন যাহা তাহারা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত হইয়াছেন। গোনাহ্ করিবার পর তো সকলেই এস্তেগফার করে। আর আল্লাহ্ওয়ালাগণ নবী ছাহাবীদের ন্যায় নেক আমল করিবার পরও এস্তেগফার করেন।

রাসূলেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাইয়েদুল মাসুমীন বা শ্রেষ্ঠ নিস্পাপ এবং সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন। তিনিই আল্লাহ্ পাকের সর্বাধিক প্রিয় বান্দা। আল্লাহ পাক তাঁহাকে যাহা দান করিয়াছেন,অপর কোন মাখলুককে উহা দান করেন নাই। এতদ্সত্ত্বেও তিনি সারারাত্র নামাজের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, ফলে তাঁহার কদম মোবারক ফুলিয়া যাইত। আল্লাহ্র জমিনে

আল্লাহ্‌র দ্বীনকে বুলন্দ করার উদ্দেশ্যে তিনি অবিরাম মেহনত করিতেন। তথাপি আল্লাহ্ পাক তাঁহাকে হুকুম করিলেন–

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝

অর্থঃ তখন স্বীয় প্রতিপালকের তাস্‌বীহ্ ও তাহমীদ (প্রশংসা) করুন আর তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি অতিশয় তওবা কবুলকারী।

পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও নিজ হইতেই বেশী বেশী এস্তেগফার করিতেন। তাঁহার অনুসরণ করা আমাদের সকলের কর্তব্য। নেক আমলের পাশাপাশি এস্তেগফার করিতে থাকা এবং সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্বাস রাখা যে, আমরা যত এবাদত বন্দেগী করিতেছি, উহার মধ্যে অবশ্যই ক্রটি–বিচ্যুতি হইতেছে। আর বান্দার পক্ষে আল্লাহ পাকের শান মোতাবেক এবাদত করা কখনো সম্ভব নহে।

শেখ শাদী বলেন–

بندہ ہماں بہ کہ زتقصیر خویش　　عذر بدرگاہِ خدا آورد
ورنہ سزاوار خداوندیش　　کس نتواند کہ بجا آورد

ভাবার্থঃ আল্লাহ্ পাকের পবিত্র জাতের শান অনুযায়ী এবাদত করিয়া কেহই স্বীয় দায়িত্ব পালন করিতে পারিবে না। সুতরাং ঐ ব্যক্তিই উত্তম যে সর্বদা আল্লাহ পাকের দরবারে নিজের ক্রটি–বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকে।

অজুর পরে এস্তেগফার করা

হাদীস–৩০

وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ كُتِبَ فِىْ رَقٍّ ثُمَّ جُعِلَ فِىْ طَابِعٍ فَلَمْ يُكْسَرْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ

অর্থঃহযরত আবু ছাইদ খুদরী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি অজুর পর নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করিবে তাহার এই দোয়াকে একটি পাত্রে মোহর করিয়া আল্লাহ্ পাকের আরশের নীচে হেফাজত করিয়া রাখা হইবে। অতঃপর কেয়ামত পর্যন্ত ঐ মোহর ভাঙ্গা হইবে না। দোয়াটি এইঃ–

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ ۔

– তাবারানী, নাসাঈ

ব্যাখ্যাঃ অজু একটি নেক আমল উহা দ্বারা গোনাহ্ ক্ষমা হয়। নামাজ কবুল হওয়ার জন্য অজু শর্ত। বিনা অজুতে নামাজ শুদ্ধ হওয়ার কোন উপায় নাই। অজুর সময় হস্ত, পা, চোখ, কান ও নাক হইতে গোনাহ্‌সমূহ ঝরিয়া পড়ে। হাদীস শরীফেও উহার বিবরণ উল্লেখ আছে। এতদ্‌সত্ত্বেও অজুর পরে এস্তেগফারের তালীম দেওয়া হইয়াছে। অজুর মধ্যে যেই সকল ক্রটি এবং সুন্নত ও মোস্তাহাবের খেলাফ আমল হইয়াছে, এস্তেগফার দ্বারা উহার ক্ষতিপূরণ হইয়া যায়। অজুর পরে যখন কেহ উপরোক্ত দোয়া পাঠ করে তখন উহা লিপিবদ্ধ করতঃ মোহর লাগাইয়া আল্লাহ্‌র আরশের নীচে হেফাজত করিয়া রাখা হয়। কেয়ামতের দিন ঐ মোহর খোলা হইবে। সেই দিন উহা তাহার কাজে আসিবে। তাহার নাজাতের ছামান হইবে। হিসনে হাসীনের শরাহ্ ফজলে মুবীনে অজুর পরে অন্যান্য দোয়ার কথাও উল্লেখ আছে।

এস্তেঞ্জার পরে এস্তেগফার

হাদীস—৩১

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ غُفْرَانَكَ

অর্থঃ হযরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন পায়খানা হইতে বাহিরে আসিতেন তখন غفرانك পড়িতেন।

– তিরমিজী, ইবনে মাজা, দারেমী।

ব্যাখ্যাঃ এস্তেঞ্জা হইতে ফারেগ হওয়ার পর বাইতুল খালার বাহিরে আসিয়া নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম غفرانك পড়িতেন, অর্থাৎ আল্লাহ পাকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন। এখানেও প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, এস্তেঞ্জা করা কোন গোনাহ্ বা অপরাধ নহে, সুতরাং উহার পরে কেন ক্ষমা প্রার্থনা করা হইল? ওলামায়ে কেরাম এই প্রশ্নের একাধিক জবাব দিয়াছেন।

(১) পায়খানায় অবস্থান কালে মুখে আল্লাহ্ পাকের জিকির করা হয় নাই। তাই পায়খানা হইতে ফারেগ হওয়ার পর এস্তেগফার করিলে ঐ জিকিরবিহীন সময়ের ক্ষতিপূরণ হয়।

(২) আল্লাহ্ পাক মানুষকে খানাপিনার নেয়ামত দান করিয়াছেন। আহারের পর উহাকে পাকস্থলীতে হজম করাইয়া মল আকারে দেহ হইতে বাহির করিয়া দেন এবং উহার প্রোটিন দ্বারা দেহকে সতেজ করেন। আল্লাহ পাকের এই সকল নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায়ের ক্ষেত্রে যেই ত্রুটি হইয়াছে এস্তেগফার দ্বারা উহার তালাফী হইবে।

(৩) নিজের জাহেরী নাপাকীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ হওয়ার ফলে বাতেনী নাপাকী বা গোনাহের কথাও স্মরণ হইবে। অতএব, এখানে গোনাহের স্মরণের পর এস্তেগফারের তালীম দেওয়া হইয়াছে।

সকল মজলিসে এস্তেগফার করা

হাদীস—৩২

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ اِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجْلِسِ يَقُوْلُ رَبِّ اغْفِرْلِي وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ مِائَةَ مَرَّةٍ

অর্থঃ হযরত ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন, আমরা প্রত্যেক মজলিসে গণনা করিতাম, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একশতবার এই শব্দগুলি উচ্চারণ করিতেন—

رَبِّ اغْفِرْلِي وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ

– আহমদ, তিরমিজী, আবু দাউদ, ইবনে মাজা।

ব্যাখ্যাঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশী বেশী এস্তেগফার করিতেন। অসংখ্য হাদীসে এই বিষয়টি উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি সম্পূর্ণ নিস্পাপ ছিলেন, তথাপি এস্তেগফারের প্রতি তিনি এতটা যত্নবান ছিলেন। এই হাদীসে বলা হইয়াছে যে, তিনি সকল মজলিসে একশত বার উপরোক্ত শব্দগুলি পাঠ করিতেন। তা ছাড়া ২৬ ও ২৮ নং হাদীসে তিনি এরশাদ করিয়াছেন, আমি দৈনিক একশত বার এস্তেগফার করি। এই সকল বর্ণনায় কোন বিরোধ নাই। সম্ভবতঃ প্রথমে দৈনিক একশতবার এস্তেগফার করিতেন। পরে সকল মজলিসেই একশতবার করিয়া এস্তেগফার করিতে শুরু করেন। এমনও হইতে পারে যে, মজলিসে এস্তেগফার ছাড়াও তিনি দৈনিক একশতবার এস্তেগফার করিতেন। অথবা নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা বুঝাইবার জন্য একশতের অংক বলা হয় নাই; বরং বর্ণনাকারী " অধিক সংখ্যা " বুঝাইবার জন্যই ঐ সংখ্যাটি ব্যবহার করিয়াছেন। (১) যাহাই হউক, আমাদের দেখিবার

---

(১) আমাদের দেশেও এই ধরনের কথার প্রচলন আছে। যেমন বলা হয় যে "একশ একবার" বলার পরও তুমি সেখানে গেলে কেন? এখানে "একশ একবার" দ্বারা নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা বুঝানো উদ্দেশ্য নেহ বরং অধিক সংখ্যা বুঝাইবার জন্যই "একশ একবার" বলা হয়।
–অনুবাদক।

বিষয় হইল,স্বয়ং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এত অধিক এস্তেগফার করিতেন তখন এই বিষয়ে আমাদের কতটা যত্নবান হওয়া উচিত? আমরা কে কি পরিমাণ এস্তেগফার করিতেছি তাহা নিজেরাই একবার তলাইয়া দেখা প্রয়োজন।

মজলিসের আলোচনার কাফ্ফারার জন্য এস্তেগফার

হাদীস—৩৩

وَعَنْ اَبِىْ بَرْزَةَ الْاَسْلَمِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جَلَسَ مَجْلِسًا يَقُوْلُ بِاٰخِرِهٖ
اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّقُوْمَ مِنَ الْمَجْلِسِ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ
اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ
اللّٰهِ اِنَّكَ لَتَقُوْلُ قَوْلًا مَّا كُنْتَ تَقُوْلُهٗ فِيْمَا مَضٰى فَقَالَ كَفَّارَةٌ لِّمَا
يَكُوْنُ فِى الْمَجْلِسِ ـ

হযরত আবু বুরজা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন মজলিসে তাশরীফ রাখিতেন তখন মজলিস শেষ হইবার পর এই দোয়া পাঠ করিতেন–

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ
وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ ـ

একদা এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এমন বাক্যসমূহ বলিলেন যাহা পূর্বে কখনো বলেন নাই। উত্তরে তিনি এরশাদ করিলেন, ইহা মজলিসে আলোচিত কথা–বার্তার কাফ্ফারা। – আবু দাউদ।

ব্যাখ্যাঃ আলোচ্য বিষয়ের হাদীস হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা এবং হযরত জোবায়ের রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতেও বর্ণিত আছে। হযরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহার বর্ণনা এইরূপ– নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মজলিসে যদি ভাল

কথা আলোচনা হইয়া থাকে তবে এই বাক্যসমূহ উহাকে মোহর করিয়া রাখিবে। আর মজলিসে যদি খারাপ কথা আলোচনা হইয়া থাকে তবে এই বাক্যসমূহ উহার জন্য কাফ্ফারা হইবে। অন্য এক রেওয়ায়েতে এই দোয়াটি তিনবার পড়িবার কথাও বলা হইয়াছে। মজলিস হইতে উঠিবার পূর্ব মুহূর্তে" উহা পাঠ করিতে হয়। হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনায় " দাড়াইবার পূর্ব মুহূর্তে বলা হইয়াছে।

আজকালকার মজলিস ও আলোচনার বৈঠক সমূহে অধিকাংশই অর্থহীন কথা–বার্তা এবং সরাসরি গোনাহের আলোচনা হইয়া থাকে। সুতরাং মজলিস শেষে উল্লেখিত দোয়াটি পাঠ করা একান্তই জরুরী। ফলে উহা দ্বারা অর্থহীন কথাবার্তার কাফ্ফারা হইয়া যাইবে। তবে হক্কুলএবাদ তথা গীবত–শেকায়েত ইত্যাদি হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে যাহার গীবত করা হইয়াছে তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে।

যাহার গীবত করা হইয়াছে তাহার জন্য এস্তেগফার করা

হাদীস—৩৪

وَعَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ كَفَّارَةِ الْغِيْبَةِ اَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنْ
اغْتَبْتَهٗ تَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهٗ

অর্থঃ হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, গীবতের এক কাফ্ফারা হইল, তুমি যাহার গীবত করিয়াছ তাহার জন্য এস্তেগফার কর। (তাহার জন্য এস্তেগফার করিয়া)এইরূপ বল– اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهٗ অর্থাৎঃ আয় আল্লাহ্! আমাকে এবং তাহাকে ক্ষমা করিয়া দাও। – বায়হাকী।

ব্যাখ্যাঃ আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, কাহারো গীবত করা এবং শোনা উভয়ই হারাম। কিন্তু গীবতের প্রকৃত সংজ্ঞা কি এবং কোন্ কোন্ বিষয়কে গীবত বলা হয় এই বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণার অভাবে অনেকেই গীবত হইতে পরহেজ করিযা চলে না।

হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, (একদা) নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ছাহাবাগণকে) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি জান, গীবত কাহাকে বলে? ছাহাবাগণ আরজ করিলেন, আল্লাহ্ এবং তাহার রাসূলই ভাল জানেন। তিনি এরশাদ করিলেন, নিজের ভাইয়ের এমন কোন দোষ আলোচনা করার নাম গীবত যাহা শুনিলে সে মনে আঘাত পাইতে পারে।

এক ছাহাবী আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই ভাইয়ের মধ্যে যদি আলোচিত দোষটি বিদ্যমান থাকে (তবে উহা গীবত হইবে কি?) এরশাদ হইলঃ তোমার ভাইয়ের মধ্যে যাহা আছে তাহাই যদি তুমি আলোচনা কর (আর উহা যদি সে অপছন্দ করে) তবেই তো তুমি গীবত করিলে। পক্ষান্তরে তাহার সম্পর্কে তুমি যদি এমন কোন আলোচনা কর যাহা তাহার মধ্যে নাই, তবে তুমি তাহার সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিলে।

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, গীবত হইল কাহারো সম্পর্কে এমন কোন আলোচনা করা যাহা শুনিতে পাইলে ঐ ব্যক্তি মনে আঘাত পাইতে পারে। আর যাহারা মনে করেন "যেই দোষ আলোচনা করা হইল উহা যদি সত্য হয় তবে উহা গীবত নহে" তাহাদের ধারণা ভুল। অর্থাৎ অনেকেই মনে করেন, কাহারো সম্পর্কে এমন কোন আলোচনা বা দোষ–ক্রুটির উল্লেখ করা যাহা সত্য সত্যই তাহার মধ্যে বিদ্যমান– তবে উহা গীবত হইবে না, এই ধারণা শরীয়ত সম্মত নহে। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, কোন মানুষের মধ্যে বিদ্যমান ক্রুটি সম্পর্কে আলোচনা করার নামই গীবত। যদি তাহার মধ্যে সেই দোষ না থাকে আর বলা হয় যে, অমুকের মধ্যে এই ক্রুটি আছে, তবে উহার নাম বোহতান বা অপবাদ (ইহা গীবত হইতে আরো মারাত্মক)।

অনেকেই বলিয়া থাকেন "আমি এই কথা তাহার মুখের উপর বলিতে পারিব।" হয়ত বলিয়াও থাকেন, কিন্তু ইহাতেই গীবত জায়েজ হইয়া যায় না। গীবত সম্পর্কে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্পষ্ট বক্তব্য হইল "কাহারো সম্পর্কে এমন আলোচনা করা যাহা শুনিতে পাইলে সে মনে আঘাত পাইতে পারে।" সুতরাং বোঝা গেল, গীবতের অপরাধ ও গোনাহের ভিত্তি হইল

"মনে কষ্ট পাওয়া" মনের এই কষ্ট সামনে বলিলেও হইবে এবং অগোচরে বলিলেও হইবে।

কালামে পাকে গীবত করাকে মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাওয়ার সঙ্গে তুলনা করিয়া বলা হইয়াছে–

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ـ

অর্থঃ আর একে অন্যের গীবত (অগোচরে দুর্নাম)ও করিও না; তোমাদের মধ্যে কেহ কি স্বীয় মৃত ভ্রাতার গোস্ত খাইতে পছন্দ করিবে? উহা তো তোমরা অবশ্যই ঘৃণা করিয়া থাক; আর আল্লাহ্কে ভয় কর; নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ বড় তওবা কবুলকারী, দয়ালু। – সুরা হুজুরাত, রুকুঃ ২

অর্থাৎ মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাওয়া যেমন অত্যন্ত ঘৃণার বিষয়, ঠিক তেমনি গীবত করাকেও তোমরা ঘৃণা কর।

গীবত করা এবং পরের মুখে গীবত শোনা উভয়ই জুলুম। শুধু মারামারি ও অর্থ ছিনতাই করার নামই জুলুম নহে, বরং কাহারো মানহানি করা (সম্মুখে বা অগোচরে) ইহাও জুলুম। বান্দার উপর কোন প্রকার জুলুম করা হইলে যতক্ষণ মজলুমের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা না করিবে অথবা জুলুমের ক্ষতিপূরণ না করিবে ততক্ষণ উহা ক্ষমা করা হইবে না। সম্পদের হক সম্পদের দ্বারাই আদায় হয়। যাহার সম্পদ নষ্ট করা হইয়াছে, সে যদি মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে তবে ঐ সম্পদ তাহার ওয়ারিশগণকে দিতে হইবে। অথবা তাহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে। কিন্তু যদি কাহারো গীবত করা হয় অথবা গীবত শোনা হয় তবে এই ক্ষেত্রে যাহার গীবত করা হইয়াছে, কেবল সেই ব্যক্তি ক্ষমা করিলেই উহা ক্ষমা হইবে। তাহার ওয়ারিশগণ উহা ক্ষমা করিতে পারিবে না।

যদি এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, যাহার গীবত করা হইয়াছে সে মৃত্যুবরণ করিয়াছে অথবা এমন জায়গায় সে অবস্থান করিতেছে যেখানে ডাক যোগাযোগ নাই এবং নিজেও সেখানে যাওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই কিংবা বহু খোঁজা খুঁজির পরও তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না, তবে এই ক্ষেত্রে উহা হইতে অব্যাহতি লাভের পথ হইল। তাহার মাগফেরাতের জন্য বেশী বেশী দোয়া

করা; যতক্ষণ না মনে মনে এইরূপ একীন হয় যে, তাহার গীবতের ক্ষতিপূরণ হইয়াছে। উপরোক্ত হাদীসে এই দোয়ার তালীম দিয়া বলা হইয়াছে–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ

– হে আল্লাহ্! আমাকে এবং তাহাকে ক্ষমা কর।

আলেমগণ লিখিয়াছেন, যাহার গীবত করা হইয়াছে সে যদি ঐ গীবত সম্পর্কে অবগত হইয়া থাকে তবে তাহার নিকট অবশ্যই ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে। পক্ষান্তরে সে যদি গীবতের খবর না পাইয়া থাকে তবে তাহার মাগফেরাতের জন্য বেশী বেশী দোয়া করিতে থাকিবে। যখন মন এই সাক্ষ্য দিবে যে, তাহার গীবত এবং তাহার জন্য কৃত মাগফেরাতের দোয়া উভয়কে তাহার সামনে হাজির করা হইলে সে মাগফেরাতের দোয়া দেখিয়া খুশী হইয়া যাইবে, তবে মনে করিতে হইবে যে, গীবতের ক্ষতিপূরণ হইয়া গিয়াছে।

শেষোক্ত ক্ষেত্রে ক্ষমা না চাহিয়া তাহার জন্য দোয়া করার কারণ এই যে, সে যখন গীবত সম্পর্কে কিছুই জানে না, সুতরাং ক্ষমা চাহিতে যাইয়া গীবত সম্পর্কে তাহাকে অবগত করাইয়া তাহার মনে ব্যথা দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। এই ক্ষেত্রে ইহাই ভাল মনে করা হইয়াছে যে, নীরবে তাহার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিয়া গীবতের তালাফী করিবে।

গীবত করা এবং শোনা উভয়ই ক্ষতিকর। অথচ এই সর্বনাশা গীবতে এমন লোকেরাও লিপ্ত যাহাদিগকে দ্বীনদার বলিয়া গণ্য করা হয়। অনেকের অবস্থা তো এইরূপ যে, গীবত না করিলে তাহাদের পেটের ভাতই হজম হয় না। গীবতের মাধ্যমে যাহারা নিজের নেকী অপরকে দিয়া দিতেছে তাহারা নিজের হাতেই নিজের ভয়াবহ ক্ষতি সাধন করিতেছে।

হাশরের মাঠে লেনদেন হইবে গোনাহ্ ও নেকী দ্বারা। সেখানে দুনিয়ার কোন মুদ্রা চলিবে না। যাহার গীবত করা হইযাছে বা শোনা হইয়াছে সে গীবতকারীর নেকী সমুহ লইয়া যাইবে। ঐ নেকী দ্বারা যদি গীবতের ক্ষতিপূরণ না হয় তবে তাহার গোনাহ্‌সমূহ গীবতকারীর মাথায় চাপাইয়া দিয়া তাহাকে দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে। হকুল এবাদের বর্ণনায় এই বিষয়ে হাদীসের উদ্ধৃতিসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

মোটকথা, মানুষের হক যেইভাবেই নষ্ট করা হউক তাহাদের সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া অথবা তাহাদের হক আদায় করিয়া উহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইবে। আর ব্যাপকভাবে সকলের জন্য নিম্নরূপ দোয়া করিবে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اتَّخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيْهِ فَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ فَاَىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ اٰذَيْتُهُ شَتَمْتُهُ لَعَنْتُهُ جَلَدْتُّهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلٰوةً وَّزَكٰوةً تُقَرِّبُهُ بِهَا اِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার দরবারে একটি নিবেদন করিতেছি এবং আশা পোষণ করিতেছি যে, আপনি উহা অবশ্যই কবুল করিবেন। আমার সেই নিবেদন এই যে, আমি একজন মানুষ; আমি যাহাকেই কষ্ট দিয়াছি, মন্দ বলিয়াছি, অভিশাপ দিয়াছি, আপনি আমার এই আমলকে তাহার জন্য রহমত, পবিত্রতা এবং আপনার নৈকট্য লাভের উছিলা বানাইয়া দিন; যাহা দ্বারা কেয়ামতের দিন আপনি তাহাকে স্বীয় নৈকট্যে ধন্য করিবেন।

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দোয়াটি ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। দোয়াটি বড়ই উপকারী। কাহাকেও কষ্ট দেওয়া তাঁহার কল্পনায়ও আসে নাই। তিনি ছিলেন সাইয়্যেদুল মোত্তাক্বীন। তথাপি তিনি উপরোক্ত দোয়া করিতেন। আল্লাহ্ পাকের মাখলুককে বিভিন্নভাবেই আমরা কষ্ট দিয়া থাকি। কখন কিভাবে কাহাকে কষ্ট দিয়াছি তাহা জানাও থাকে না। সুতরাং হকুল এবাদ আদায়ের পাশাপাশি নিয়মিত এই দোয়াটি জারী রাখিলে বিশেষ লাভবান হওয়া যাইবে।

মৃত মাতা–পিতার জন্য এস্তেগফার করা

হাদীস–৩৫

وَعَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَمُوْتُ وَالِدَاهُ اَوْ اَحَدُهُمَا وَاِنَّهُ

لَعَاقٌ فَلَا يَزَالُ يَدْعُوْلَهُمَا وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمَا حَتّٰى يَكْتُبَهُ بَارًّا

অর্থঃ হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কাহারো মাতা-পিতা উভয়ে অথবা তাহাদের যে কোন একজন যদি এমন অবস্থায় ইন্তেকাল করে যে, তাহাদের জীবিত অবস্থায় সে তাহাদের নাফরমানী করিত এবং তাহাদিগকে কষ্ট দিত। অতঃপর যদি সে তাহাদের ইন্তেকালের পর তাহাদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিতে থাকে তবে আল্লাহ্ পাক তাহাকে মাতা-পিতার সাথে ভাল ব্যবহারকারীদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেন।

— মেশকাতুল মাছাবীহ।

হাদীস—৩৬

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِى الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ اَنّٰى لِىْ هٰذِهٖ فَيَقُوْلُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ

হযরত আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ পাক বেহেস্তে নেক বান্দাদের মরতবা বৃদ্ধি করিয়া দিলে তাহারা জিজ্ঞাসা করিবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি এই মরতবা কিভাবে লাভ করিলাম? উত্তরে আল্লাহ্ পাক বলিবেন, তোমার সন্তানগণ তোমার জন্য যেই মাগফেরাতের দোয়া করিয়াছে, উহার বিনিময়ে তুমি ইহা লাভ করিয়াছ।

— মেশকাতুল মাছাবীহ্

মৃত মুসলমানের জন্য এস্তেগফার করা

হাদীস—৩৭

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْمَيِّتُ فِى الْقَبْرِ اِلَّا كَالْغَرِيْقِ

الْمُتَغَوِّثِ يَنْتَظِرُ دَعْوَةً تَلْحَقُهُ مِنْ اَبٍ اَوْ اُمٍّ اَوْ اَخٍ اَوْ صَدِيْقٍ فَاِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَيُدْخِلُ عَلٰى اَهْلِ الْقُبُوْرِ مِنْ دُعَاءِ اَهْلِ الْاَرْضِ اَمْثَالَ الْجِبَالِ وَاِنَّ هَدِيَّةَ الْاَحْيَاءِ اِلَى الْاَمْوَاتِ الْاِسْتِغْفَارُ لَهُمْ ـ

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ডুবন্ত মানুষ যেমন (সাহায্যের আশায়) ফরিয়াদ করিতে থাকে, ঠিক তেমনি মৃত ব্যক্তি কবরের মধ্যে তাহার মাতা-পিতা, ভাই বেরাদর ও দোস্ত আহবাবের পক্ষ হইতে দোয়ার আশা করিতে থাকে। অতঃপর যখন সে তাহাদের পক্ষ হইতে কোন দোয়া পায় তখন উহা তাহার নিকট গোটা পৃথিবী এবং উহার যাবতীয় সম্পদ হইতেও অধিক প্রিয় মনে হয়। আর ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, আল্লাহ্ পাক পৃথিবী বাসীদের দোয়ার ফলে কবরবাসীদের জন্য পাহাড় পরিমাণ (ছাওয়াব) কবরে পৌছাইয়া দেন এবং নিঃসন্দেহে মৃতদের জন্য জীবিতদের হাদিয়া হইল, তাহাদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করা।

—বায়হাকী।

সকল মুসলমানের মাগফেরাত কামনা করার ফজিলত

হাদীস—৩:

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةً ـ

অর্থঃ হযরত আবু উবাদা বিন ছামিত রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি, যেই ব্যক্তি মুসলমান নর-নারীদের জন্য এস্তেগফারের দোয়া করিবে আল্লাহ্ পাক তাহাকে ঐ এস্তেগফারের বিনিময়ে সকলের পক্ষ হইতে একটি করিয়া নেকী লিখিয়া দিবেন। — তাবরানী

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদীসে সাধারণভাবে সকল মুসলমান নর-নারীর মাগফেরাতের জন্য দোয়া করার ফজিলত বর্ণনা করা হইয়াছে। মৃত-জীবিত যত মুসলমানের জন্য দোয়া করা হইবে তাহাদের সকলের সংখ্যা পরিমাণ ছাওয়াব, যে দোয়া করিবে তাহার নামে লেখা হইবে। ছোবহানাল্লাহ! আল্লাহ্ পাক নেকী কামাইবার কত সহজ সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। সামান্য সময় ব্যয় করিয়া মানুষের জন্য দোয়া করিলে লক্ষ-কোটি নেকী লাভ করা যাইতে পারে।

আয় আল্লাহ্! জীবিত ও মৃত সকল মুসলমান নর-নারীকে তুমি ক্ষমা করিয়া দাও।

এস্তেগফার আজাবকে বাধা দেয়

হাদীস-৩৯

وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيَّ أَمَانَيْنِ لِأُمَّتِي "وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ" فَإِذَا مَضَيْتُ تَرَكْتُ فِيهِمُ الْاِسْتِغْفَارَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

অর্থঃ হযরত আবু মূছা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ পাক আমার নিকট আমার উম্মতের জন্য দুইটি নিরাপত্তা দান করিয়াছেন। (নিম্নের আয়াতে উহা বর্ণিত হইয়াছে)

وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ -

অর্থঃ আর আল্লাহ্ তায়ালা এইরূপ করিবেন না যে, আপনি তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিবেন। আর আল্লাহ্ এই অবস্থায়ও তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিবেন না যে, তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকে।

যখন আমি ইন্তেকাল করিব তখন (একটি নিরাপত্তা উঠিয়া যাইবে এবং অপর নিরাপত্তা অর্থাৎ) এস্তেগফার কেয়ামত পর্যন্ত তাহাদের জন্য ছাড়িয়া যাইব। - তাবরানী।

হযরত আনাস রাজিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, একদা আবু জেহেল আল্লাহ্ পাকের নিকট এই দোয়া করিল, হে আল্লাহ্! এই কোরআন যদি সত্যই আপনার কালাম হইয়া থাকে তবে ইহাকে অমান্য করার কারণে আকাশ হইতে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের উপর অন্য কোন কষ্টদায়ক আজাব নাজিল করুন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ পাক হাদীসে বর্ণিত উপরোক্ত আয়াতটি নাজিল করিলেন।

- বোখারী হইতে দুররে মনছুর।

হাদীসে পাকে বর্ণিত আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে আল্লাহ্ পাক দুনিয়াতে আজাব নাজিল করিবেন না। আর যাহারা এস্তেগফার করিতে থাকিবে তাহারাও আল্লাহ্র আজাব হইতে নিরাপদ থাকিবে।

দুনিয়াবী বালা-মুছীবত হইতে নিরাপদ থাকার ব্যাপারে দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথমতঃ "নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতি" এই নেয়ামত ধরিয়া রাখা মানুষের সাধ্যের বাহিরে। ইহাতে মানুষের কোন হাত নাই। আল্লাহ্ পাকের যখন ইচ্ছা হইয়াছে তখন তিনি স্বীয় হাবীবকে উঠাইয়া নিয়াছেন। অপর বিষয়টি হইল এস্তেগফার করিতে থাকা- ইহা মানুষের এখ্তিয়ারী বা ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা করিলেই মানুষ ইহা করিতে পারে। অর্থাৎ মানুষ ইচ্ছা করিলে পার্থিব নিরাপত্তার এই দ্বিতীয় সুযোগটি কেয়ামত পর্যন্ত গ্রহণ করিতে পারে।

মোটকথা, উপরোক্ত হাদীসে বলা হইয়াছে যে,আল্লাহ্ পাক মানুষের জন্য দুইটি নিরাপত্তা নাজিল করিয়াছেন। একটি হইল নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র উপস্থিতি, অপরটি এস্তেগফার। তাহার ওফাতের পর কেয়ামত পর্যন্ত এস্তেগফারের মাধ্যমে নিরাপত্তা গ্রহণের সুযোগ অব্যাহত থাকিবে।

মক্কার কাফেরদের নেতা ছিল আবু জেহেল। সে আকাশ হইতে পাথর নিক্ষেপ অথবা অন্য কোন আজাব প্রার্থনা করিয়াছিল। কিন্তু আল্লাহ্ পাক নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতি ও তাহাদের এস্তেগফারের কারণে আজাব নাজিল করা অনুমোদন করেন নাই। এখানে স্মরণ করা যাইতে পারে যে, হিজরতের পূর্বে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার কাফেরদের মধ্যেই অবস্থান করিতেছিলেন। আর তৎকালে কাফেরগণও (তাহাদের ভ্রান্ত রীতি অনুযায়ী হজ্ব আদায়ের সময় বাক্য উচ্চারণ করিত) এই বাক্যটি মাগফেরাত বা ক্ষমা প্রার্থনার জন্য ব্যবহৃত হয়। মোটকথা, এস্তেগফারের উছিলায় মক্কাবাসীগণ কুফরী অবস্থায়ও যদি দুনিয়াবী আজাব হইতে নিরাপত্তা লাভ করিয়া থাকে তবে মুসলমানগণ এস্তেগফার করিলে আরো উত্তমভাবেই দুনিয়ার আজাব হইতে নিরাপদ থাকিবে।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেল যে, আল্লাহ্ পাকের আজাব হইতে নিরাপদ থাকার উপায় হইল এস্তেগফারে লিপ্ত থাকা। আরো সোজা কথায় এস্তেগফার যেন আল্লাহ্ পাকের আজাব হইতে নিরাপদ থাকার দুর্গবিশেষ। এস্তেগফার করিলে দুনিয়ার আজাব হইতে নিরাপদ থাকা যায়। আর শরীয়তের উসুল অনুযায়ী পাকা তওবা করিলে আখেরাতের আজাব হইতেও মুক্তি পাওয়া যায়।

সকল বালা–মুসীবত হইতে মুক্তির জন্য এস্তেগফার করা

হাদীস–৪০

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَزِمَ الاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجًا وَّمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَّرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ـ

অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি এস্তেগফার করিতে থাকিবে আল্লাহ্ পাক তাহাকে যাবতীয় মুশকিলাত হইতে মুক্তির উপায় করিয়া দিবেন এবং সকল পেরেশানী দূর করিয়া দিবেন। আর এমন জায়গা হইতে রিজিকের ব্যবস্থা করিবেন যাহা সে কল্পনাও করিতে পারিবে না। – আহ্মদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা।

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদীসে পাকে বেশী বেশী এস্তেগফারের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, যেই ব্যক্তি এস্তেগফার করিতে থাকিবে আল্লাহ্ পাক তাহাকে যাবতীয় বালা–মুসীবত হইতে মুক্তির উপায় করিয়া দিবেন এবং তাহার সকল পেরেশানী দূর করিয়া দিবেন। বান্দার প্রতি ইহা আল্লাহ্ পাকের বিশেষ নেয়ামত বটে।

পার্থিব জীবনে মানুষ বিবিধ বালা–মুসীবত ও পেরেশানী হইতে বাঁচিবার জন্য কতভাবে চেষ্টা–তদ্বির ও মেহনত করিতে থাকে, রিজিকের সন্ধানে মানুষের প্রাণান্ত শ্রমের কোন ইয়ত্তা নাই। অথচ মানুষ এস্তেগফার করে না। এস্তেগফারের মাধ্যমে মানুষ নিশ্চিতভাবে এই সকল মৌলিক বিষয়ের সহজ সমাধান পাইতে পারে। মহান আল্লাহ্ পাক এবং তাহার রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াদা করিয়াছেন, নিয়মিত এস্তেগফার করিলে বান্দা অজস্র ধারায় লাভবান হইতে থাকিবে। সুতরাং হে মুসলমান ভাই সকল! তওবা ও এস্তেগফারের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকের দিকে রুজু হইলেই মানুষ জীবনের প্রকৃত নিরাপত্তা ও শান্তি লাভ করিতে পারে।